

সূর্য্যমুখী

উপন্যাস

বুদ্ধদেব বসু

প্রণীত

প্রকাশক : শ্রীমলিনীকুমার মজুমদার

শ্রী গুরু লাইব্রেরী

২০৪, কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা

482

প্রথম সংস্করণ :

মে, ১৯৩৪

দাম দেড় টাকা

मूर्याग्रुशी

বুদ্ধদেব বসু

প্রণীত

অন্যান্য উপন্যাস :

সাদা, অকর্মণ্য, মন-দেয়া-নেয়া, রঙে-ডেনডুন-গুচ্ছ,
সানন্দা, যবনিকা-পতন, যেদিন কুটলো কমল,
আমার বন্ধু, ধসর গোষ্ঠি, ছে বিজটী বীর,
অসুখাঙ্গা

তাদের বিয়ে হ'লো।

শ্রাবণের এক ছেঁড়া-মেঘ রাতে, অত্যন্ত শান্তভাবে, অনাড়ম্বর, প্রায় চুপে-চুপে তাদের বিয়ে হ'লো। কেউ জানলে না। মিহিরের সাহিত্যিক-বন্ধুদের মধ্যে কেউ নয়। যে জর্নালিস্ট চোকরা মাঝে-মাঝে তার বাড়িতে আসে তার সম্বন্ধে খবর সংগ্রহ করে' সহরে প্রচার করবার ছত্তে, সে-ও নয়। অফিসটানের কোনো আতিশয্য হ'লো না। যেহেতু বাপের বাড়ির অবস্থাও তার অল্পকূল নয়। তারা গরিব—দুঃস্বপ্নমত গরিব, নিছক গরিব কপালে না বোঝায়। গরিব ভদ্রলোক—সব চেয়ে ভয়াবহ গরিবত।

অবিশ্রিত মিহিরও বড়লোক নয়। না—বড়লোক তাকে কোনোক্রমেই বলা যায় না। কিন্তু তার জগতে, তার জীবনে, একজনের আয়ের অঙ্কে কিছু এসে যায় না। কেননা সে কবি। সে আর্টিস্ট। সে প্রতিভাবান—অনেক তা-ই মনে করে। তার গৌরব, তার মর্যাদা—সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ জাতের। সেখানে তার ব্যাঙ্কের খাতা সম্পূর্ণ অব্যবহৃত। অনেকের বিশ্বাস, বাড়ীলা কবিতাকে সম্পূর্ণ নতুন রাস্তায় সে নিয়ে গেছে—যদিও তার বহুশ মাত্র পঁচিশ। নিজেকে সে গরিব কি বড়লোক বলে' ভাবতে দেখেনি: সে যে কখনো, কোনো-এক বিকেলে হঠাৎ আধ ঘণ্টার মধ্যে আশ্চর্য্য এবং অনিন্দ্য করেকটি লাইন লিখে ফেলত

সূর্য্যদূষী

পেরেছে, সে-ই তো তার পরম ঐশ্বর্য্য। সেখানে অল্প কিছুই কথা ওঠে না। তার জীবনের সুরই বে আলাদা। তার ভাবনা, তার মূল্যবোধ, তার সম্মান—সবই অল্প রকম। সে-সব বুঝবে না ছ' পারে দাঁড়ানো ব্যাকের খাতা, পৃথিবীকে বারং বারং তরে' রেখেছে।

তবু, কবিকেও খেতে হয়। সুদীর্ঘানার দেনা মেটাতে হয় তাকেও, বাড়িওয়ালা কবি বলে' খাতির করে না। ইত্যাদি, ইত্যাদি। আজকালকার পৃথিবীতে পরসা ছাড়া এক পা চলবার উপায় নেই। আত্মার গভীর, গোপন তৃষ্ণা মেটাতেও পরসার দরকার। পরসা ছাড়া বই কেনা যায় না। পরসা না থাকলে অলস অবসরে আকাশের দিকে তাকিয়ে একটু চুপ করে' থেকেও শান্তি নেই।

তার কপাল ভালো, সেটুকু পরসা ছিলো এই কবির। বরং, তার মা-র ছিলো। এই এক ছেলে নিয়ে হৈমন্তী বিধবা হন। পনরো বছর আগে—তার বয়েস বখন আটত্রিশ। অনেক দিন পর্য্যন্ত এমন মনে হয়েছিলো যে তাঁর কোনো সম্মান হবে না। সবাই আশা ছেড়ে দিয়েছিলো। এমন সময়, তিরিশের কাছাকাছি এসে, আকস্মিক, আশাতীত, তাঁর প্রথম মাতৃহ। এই প্রথম, এই শেষ। মিহির! আর সেই সময় থেকে, তার জন্ম থেকে এই দুই জীবন পরম্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য জড়িত : এর মূল ওর মধ্যে, একেবারে ঐশ্বরের উৎস অস্ত্রের হৃৎকেন্দ্রে—অচৈতন্তে, অন্ধকারে। বাবা

সূর্যমুখী

তার জীবনে একটা ব্যক্তিগত সত্য হ'য়ে উঠতে পারার আগেই তিনি মারা গেলেন। কেবল মা-নিরে তার জীবন। নিঃশ্বাসের মত তা সহজ, চিরস্থান—তা টের পাওয়া যায় না। তা নিরে ভাবতে হয় না। হৈমন্তী তাঁর ছেলের জীবনকে জড়িয়ে ধরেছেন, লালন করেছেন : পরিত, উন্নীলিত করে' তুলেছেন—তাঁর সমস্ত প্রাণ দিয়ে, প্রতি মুহূর্তে, নিঃশেষে। স্বতঃস্ফূর্ত, নিরবচ্ছিন্ন শ্রোত, বাতাসের মত সহজ—তা টের পাওয়া যায় না।

হুঁজনার মধ্যে নিবিড় নির্ভুর ভালোবাসা। মিহির পরিপূর্ণ তার মা-র মধ্যেই। যেন তার মা-র শরীর থেকে নিঃসৃত একটি আবহাওয়া তাকে ঘিরে রেখেছিলো নিটোল সোনালি শান্তিতে। সেই শান্তিতে সে তৃপ্ত। হৈমন্তী তাকে বিরেছেন অঙ্গশর—নিজের জীবন নিরে একা থাকতে। বিরল, অমূল্য উপহার। তাকে কিছু করতে হয় না। জীবনের যে-দিকটা ব্যবসাদারি, তার ভার হৈমন্তীর। তিনিই কথা বলেন বাড়িওয়ালা থেকে আরম্ভ করে' জমাদার পর্যন্ত সকলের সঙ্গে। খরচ করেন, গুণে নেন ফেরত পরস্যা, রাখেন হিসেব। হিসেব—মিহিরের জীবনের চরম বিতৃষ্ণা, যে-কোনোরকমের অঙ্ক বেখলেই সে জীবৎ অম্লহ বোধ করে। হৈমন্তীর প্রথম সাংসারিক জ্ঞান—পরিমিত আর থেকে তিনি নিঙড়ে বার করেন বতটা আরাধ সম্ভব, বতটা স্বচ্ছন্দ্য। মিহির আরাধের জীব। তার খাওয়া, তার শোয়া, তার পোশাক—

সূর্যমুখী

কোথাও কোনো-কিছুর এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটলে সে অশান্তি বোধ করে। রান্না করতে হয় মুগ্ধরীকে, ঘর-বাড়ি তকতকে-ঝকঝকে রাখতে হয়, জামা-কাপড় কাচতে হয় দরকার হ'লে, যখন আর-কিছু নেই কোনো-না-কোনো সেলাই করবার থাকেই। সময়ের চাপ তাঁকে অনুভব করতে হ'তো না—যথেষ্ট কাজ, দিন ভরে' রাখবার পক্ষে, জীবন ভরে' রাখবার পক্ষে যথেষ্ট কাজ।

আর মিহির ভালোবাসতো এই আরাম, শরীরের এই স্বাচ্ছন্দ্য। কোনো-কম শারীরিক অনুবিধে হ'লে সে বিরক্ত হ'তো : একদিন ~~কাজের~~ উপকরণে একটু কমতি হ'লে, কোনো বিকেলে চা খেতে একটু দেরি হ'লে সে মেজাজ ঠিক রাখতে পারতো না। শরীরকে জুলে' থাকবার জন্তই তাকে স্নেহে রাখতে হয়। শরীর যেন বাপা দিতে না আসে তার আশ্চর্য্য সব চিন্তায়। তার কবিতা লেখায়।

এমনি করে' যদি সমস্ত জীবন কাটতো! তা-ই কাটবে—অনেকদিন পর্য্যন্ত মিহির তা-ই জানতো। কিছু সময় কাটে, মানুষের বয়েস বাড়ে। বয়েস বাড়ে, মানুষের শরীর ভেঙে পড়ে। কী ভয়ানক! কী অজ্ঞায়, কী নির্ভর অজ্ঞায়।

অবিশ্রি তার মা-কে বুড়ো দেখায় না। মা-কে কখনো সে বুড়ো বলে' ভাবতে পারে না। মা যদি কখনো বলেন, 'এই বুড়ো বয়েসে—' কথাটা শুনে অসহ্য রাগ হয়। বুড়তা—নিজেকে বুড়ো বলে' ভাবা। কী যেন—তার মনে হ'তো, তার মা কখনো

সূর্যাস্ত

বুড়ো হবেন না। ঘাড়ের কাছে হাঁটা তাঁর ঘন কঁকড়া চুল
সাদা হ'য়ে আসছে, তা সত্যি; ছোটো একটা দাঁত পড়েছে, চোখের
নিচের পাতা কঁকড়ে আসছে। তা সত্যি। কিন্তু কী সুন্দর
এখনো তিনি দেখতে। মন্থণ শুভ্র ঘাড়, শুভ্র নিটোল হাতের
কব্জি—বোলো বছরের মেয়ের মত। সাদার আর কালোর মেশানো
চুলে আলো আর ছায়া। সত্যি, বোলো বছরের মেয়ের মতই
তাঁর মুখের লাবণ্য। কেন মিছিমিছি এ-কথা ভাবতে যাওয়া
যে বুড়ো হয়েছি? বুড়ো—কথাটা শুনেই গা-টা কী-রকম
শিউরে ওঠে না! সেই বুড়ো তার মা কখনো হবেন?
অসম্ভব।

তবু—ছোট্ট একটা কথা লুকোনো দীর্ঘশ্বাসের মত মাঝে-
মাঝে শোনা বেতে লাগলো। আর পারিনে, আর পারিনে।
আর মিহিরের রক্তের স্রোতে যেন তা বরফের কুচি ছিটিয়ে দিবে
গেলো—সেই ছোট্ট শূন্য দীর্ঘশ্বাস : আর পারিনে, আর পারিনে।
এক-একদিন হঠাৎ তার চোখে পড়তো লাল উল্লুনের ধারে বসে'
তার মা রেঁধে যাচ্ছেন—কালো হ'য়ে উঠেছে তাঁর মুখ। আর
হঠাৎ তার সমস্ত রক্ত যেন অঝোঁ হিম হ'য়ে যেতো। কোনো-
কোনো রাতে পাশের ঘর থেকে মা-র অশ্রুট গোষ্ঠানির শব্দ আসতো
তার কানে। আর বে-রাত্রিকে সে প্রিয়তার মত ভালোবাসে তা বিদ্য
হ'য়ে উঠতো। নিজেকে তার মনে হ'তো যেন অপরাধী—আর

সূর্যাস্ত

সেই মনে হওয়াকে সে ঘৃণা করতো। তার অপরাধ কোথায় ? সে কি থাকবে না ? সে কি বাঁচবে না ?

কিন্তু সেই ছোট্ট চাপা আগুয়াজ কিছুতেই মিলোচ্ছে না : আর পারিনে, আর পারিনে। তা তার শান্তির সময়েও হানা দিতে আরম্ভ করলো। কখনো-কখনো তা তার সমস্ত খাওয়ার আনন্দ কেড়ে নিতো—বধন সে দেখতো তার মা-র আগুনের আছে শুকনো একাগ্র মুখ। কুশ্রীতা সে সহিতে পারে না ; কেন তার মা সব সময় স্নানর হ'তে পারেন না, আলগে তিনি যেমন ? বে-জিনিস খেতে ভালো, তা তৈরি করতে এত কষ্ট কেন ? কী অবিচার। নিজের দেশের উপর তার রাগ হ'তো, এখানকার রান্নার স্বত্বপাতি এমন বন্ধর বলে'। আধুনিক কল-কল্যাণালা রান্নাঘর হ'লে...না, তাকে খামকা এ-রকম অপরাধী করে' তোলাবার অধিকার কারো নেই।

যা-ই হোক, কথাটাকে সে মনের মধ্যে চাপা দেবার চেষ্টা করলো। কাটলো সময়। অল্পের সংস্কে মিহিরের যতখানি বিবেচনা, এমন সাধারণত দেখা যায় না। বাড়ির চাকরকে কোনো বাড়তি কাজের কথা বলতে সে কুণ্ঠিত হ'রে উঠতো। কেবল তার মা-র পরিশ্রম সংস্কেই যেন কোনো বিধা ছিলো না তার মনে। মা-র কাজ করাটাই যেন স্বাভাবিক, স্নানর। কেননা আমরা শুধু তার হাত থেকেই সেবা নিতে পারি, এক নিতে চাই, বাক্যে

সূর্যাস্থা

ভালোবাসি। এবং বে ভালোবাসে বলে' জানি। মন তার প্রতি উদাসীন, তার সুবিধার লেশমাত্র হানিতে চঞ্চল হ'য়ে উঠি, কিন্তু ভালোবাসি বাক্যে, তাকে খাটিয়ে মারতে বাধে না। ভালোবাসার গতি বিচিত্র।

কিন্তু হৈমন্তীর শরীর সত্যি বেন আর পেয়ে উঠছে না। প্রায়ই তিনি অসুস্থ হ'য়ে পড়ছেন। তবু চা আসছে ঠিক সময়ে। মাছের রান্নার বৈচিত্র্য থরকি হচ্ছে না। তবু এক-এক সকাল-বেলার, বালতির পর বালতি জল ঢেলে ঘরের মধ্যে তিনি ঝকঝক করে' তুলছেন। আর মিহিরের বুকের ভিতর দিয়ে বেন একটা ঠাণ্ডা, সাদা কাপুনি নেমে যায়—তাকে উব-হাঁটু হ'য়ে বসে' ধর লাফ করতে দেখে।

কথাটা কী করে' প্রথম ওঠে মিহিরের মনে নেই। কিন্তু একদিন সেটা উচ্চারিত হ'লো। আর সেটা রয়ে' গেলো—বন্ধুক চোড়বার পর বাতাসে ধোঁয়ার গন্ধের মত। তা রয়ে' গেলো, বাতাসে একটা তারি অসুস্থি, তা কিছুতেই সরে' যাবে না। মিহিরের মনে হ'তে লাগলো যেন কোনো শত্রু অন্তায় কোঁশলে তাকে কোণ-ঠাসা করেছে। বেরোবার পথ নেই। তার মনের মধ্যে একটা অন্ধ চাপা রাগ গুমরে মরতে লাগলো।

তার জীবনে স্ত্রীর কোনো প্রয়োজন নেই। পুরুষ যে-সব কারণে বিয়ে করে তার একটাও এখন তার পক্ষে খাটে না। এ-পর্যন্ত সে

সূর্য্যবুধী

বিয়ের কথা কখনো তাবেই নি। তা মনে ধরেছে একেবারে অবাস্তব, নিছক বাহ্যিক। অথচ তার জীবনে জীলোকের প্রয়োজন মর্মান্তিক। তাকে ভালোবাসতে, তার সেবা করতে তার শরীরের সম্পূর্ণ আরাণ্য সৃষ্টি করতে। মা-ই তো আছে—আর এসব ব্যাপারে মা-র মত আর কে? যে মা ভালোবাসে, তার মত অপকৃষ্ট জীব কোন্ জীব? এমন কোমল, এমন নীরব, আত্ম-সমর্পণে এমন নিঃশেষিত? ক্রীতদাসীর মত তার নীরব, অবিরল সেবা। ছেলের খাওয়ার কাছে মা যেমন চুপ করে বসে থাকে, আত্ম-বিস্মৃত, ভালোবাসার মগ্ন, এমন পারবে কোন্ জীব? (জীব অনেক-কিছু চায়, মা কিছু চায় না। মা কিছু চায় না; কেবল হ'তে দেয়, কেবল ছুটিয়ে তোলে।) জীব ভালোবাসা চায়, ভালোবাসার ক্ষুধার স্বামীকে সে ছিঁড়ে ফেলতে পারে; মা-কে ভালোবাসবার পর্য্যন্ত দরকার করে না। (জীব কাছে অনেক দাবির, অনেক কথার, অনেক সংঘাতের ক্ষয়: মা-র কাছে শান্ত নীরব সম্পূর্ণ অখণ্ডতা।)

অথচ বিয়ে সত্ত্বে তার মনে একটা স্বপ্নও আছে। সে কবি: সে প্রেম বোকে, সে প্রেম চায়। সেই রহস্য আর আতঙ্ক আর উদ্ভাদনা! যে-চাকা জ্যোৎস্নার অম্পট উত্তরোল তরাল সমুদ্র। অনেক রাতে শূন্য মাঠের উপর দিগে ভেসে-আসা হঠাৎ দক্ষিণে হাওয়া—চোখে বাতে জল এসে পড়ে। অনেক ছবি সে দেখেছে

সূৰ্য্যমুখা

—চোখে দেখেছে মনের মধ্যে নতুন করে' সৃষ্টি করে' দেখেছে। অনেক অনুভূতি এসেছে তার জীবনে—প্রথমে তার শরীরের জীবনে, তারপর তার জীবনের নতুন হ'য়ে; অপকৃপ হ'য়ে। সেই সব—সব জড়িয়ে, মিশিয়ে, একত্র করে' চরম করে' সে চার সেই মেয়েতে, যাকে সে চাইবে, যাকে সে চাইবে রক্তের সমুদ্রের সমস্ত উত্তরোল হিংস্রতা দিয়ে।

আর তাকেই কি শেষ পর্য্যন্ত বিয়ে করতে হবে বে-হুতু রান্না করবার জন্তে একজন লোক দরকার? বেহুতু সকালে তার ঘুম ভাঙবার আগে চাঁটেরি করবার জন্তে কেউ না থাকলে চলে না? ভাগ্যের বিজ্ঞপ! আর কী নিষ্ঠুর বিজ্ঞপ। খুব রুচিসম্পন্নও নয়।

কিন্তু তা-ই বে। তার না তা-ই চান। আর সত্যি কথাটা যদি বলতেই হয়, সেও তা-ই চায়। তার পরিচর্য্যার জন্ত একজন স্ত্রীলোক দরকার। তা না হ'লে সে বাঁচবে না। স্ত্রীলোক ছাড়া সে বাঁচতে পারে না—যা-ই বলো আর যা-ই করো। তার যা-ই তাকে এ-অভ্যাস করিয়েছেন। আর এখন তিনি বলছেন আর পারিনে। আর পারিনে! আর পারিনে! কী অজ্ঞার! মিহিরের মনে হ'তে লাগলো যেন কেউ তার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছে। কেউ যেন কথা দিয়ে কথা রাখেনি। এ রকম তো কথা ছিলো না—এ আবার কী? তার নিছক শারীরিক কয়েকটা

সূর্যমুখী

আগামের জন্তেই কি এখন তাকে বিয়ে করতে হবে? কী অপমান, কী লজ্জা কিন্তু এ-কথা সে তো ছোর করে' বলতে পারে না—না, দূর হ! দূর হ! আমি আমার নিজের ব্যবস্থা নিজেই করতে পারবো। কেননা সে তা পারে না। লেগানে তার চলে না জীলোক না হ'লে। ভাড়াটে চাকরের হাতে নিজেকে সমর্পণ করবার কথা ভাবতে পারে না সে। এদিকে সময় কাটছে, মা-র ব্যয় বাড়াচ্ছে। এমনি চিরকাল চলতে পারে না। মিহির আর ভাবতে পারে না; সে চোখ বুজে ফেলে, যেন কোনো অজ্ঞাত আশঙ্কাকে এড়াবার জন্ত। কী অজ্ঞার। কী নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর অজ্ঞার! তার বুকের ভিতরে একটা অন্ধ নির্দোষ চাপা রাগ প্রতি মুহূর্তে ফেটে পড়তে চাইছে।

আর মিহির নিজের মধ্যে ছটফট করতে লাগলো—কোণ-ঠাসা কোনো জন্তুর মত। না—এ ভাবা যায় না, এ হ'তেই পারে না। এ তার হৃদয়লতার উপর অজ্ঞার সুযোগ নেয়া—নিচক অত্যাচার তার উপর। আর তবু—মা-র সেই ছোট্ট, স্থল্ল দীর্ঘশ্বাস-স্বর তাকে হানা দিতে লাগলো, আর মার চোখের নিচে গভীর হ'য়ে পড়তে লাগলো রেখা। আর প্রায়ই তাঁকে কেমন ভ্রান দেখাতো—যেন শরীরের রক্ত শুকিয়ে আসছে। আর ছেলের বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড হঠাৎ প্রচণ্ড ব্যথার বিক্ষারিত হ'তো, সেই মুখের দিকে তাকিয়ে।

সূর্যাস্ত

শেষটায় একদিন সে বললে, 'আমি এখন বিয়ে করলে তুমি সত্যি খুসি হও ?

হৈমন্তী বললেন : 'সত্যি খুসি হই।'

আর এমনি করেই' বিয়ে হ'লো। উত্তাপহীন, আনন্দহীন। নিয়তির মত অন্ধ, নিয়তির মত নিষ্ঠুর। কোনো অদৃষ্ট অন্ধ শক্তি তাকে আঁকড়ে ধরেছে—তার সমস্ত মানুষ-শক্তি, পুরুষ-শক্তি সেখানে বার্ষি। সে কিছু করতে পারে না। আচ্ছা, হোক তবে। হয়-তো এতে সত্যি-সত্যি এতটা কিছু এসে যায় না, যতটা সে মনে করছে। তার বুক একবারও একটু কেঁপে উঠলো না—কোনো ভয়ে কি কোনো স্ত্রীকে কি কোনো প্রত্যাশায়। মনকে সে পাখর করে' তুললে। শুধু পাখরের দেয়ালে অবরুদ্ধ সেই অন্ধ চাপা রাগ।

যা-কিছু করবার হৈমন্তীই করলেন। মৃণাল তাঁর খোঁজেই ছিলো। তাদের পরিবারের সঙ্গে ছিলো তাঁর জানাশোনা। মেয়েটি কালো, কিন্তু মুগ্ধী সুন্দর। লেখাপড়া শেখেনি, কিন্তু গৃহকর্মে অসামান্য নৈপুণ্য। আঠারো থেকে উনিশের মাকামাকি বয়েস। ঠিক যে-রকম মেয়ে হৈমন্তী চান, যার হাতে তিনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ছেলেকে দিয়ে বেতে পারবেন। অনেকদিন থেকেই তাঁর মন পড়েছিলো এ-মেয়ের উপর। তিনি ঘেরি করলেন না।

সূৰ্য্যমুখী

‘মেরেটিকে একবার গিয়ে দেখে আসবি, মিছির ?’

‘কী হবে দেখে। চের তো সময় পাবো দেখবার।’

তারপর, বিবাহ-লগ্নে বখন কন্ডার মুখের দিকে তার তাঁকাবার
কণা, সে দৃষ্টিহীন চোখে সামনের শূন্নের মধ্যে তাকিয়ে রইলো
—কিছু দেখলে না, কিছু বুঝলে না। আর হঠাৎ সেই অন্ধ চাপা
রাগ তার গলার কাছে উচ্ছ্বসিত হ’রে কেটে পড়লো—যেন গলা
টিপে তাকে মেরে ফেলবে।

হৈমন্তী আর মৃণালে চমৎকার মিললো—কবিতার দুই চরণের মত। বাড়ির মধ্যে প্রায়ই এরা ছ'জন একসঙ্গে। হৈমন্তী তৈরি করছেন তাঁর প্রতিনিধিকে। মিহিরের সমস্ত শারীরিক অভ্যাস তার জানা চাই, তার শরীরের অসংখ্য তুচ্ছ প্রয়োজন—যে-সম্বন্ধে মিহির নিজেকে ভালো করে সচেতনও নয়, তাদের পরিতৃপ্তি এমনই নিয়মিত, নির্ভুল, যন্ত্রের মত মন্থণ। তার জন্তে কখনো চেষ্টা করতে হয় না : যেন অভাবই তার তৃপ্তিকে সৃষ্টি করে, গভীর শিশুর নিশ্চৈতন্য জীবনের মত। প্রতিদিনের জীবনে প্রতি মুহূর্তে কত জিনিস যে আমাদের শরীরের দরকার তা আমরা কখনো বুঝতেও পারিনে—যতক্ষণ কাছে থাকে কোনো স্ত্রীলোক, কোনো স্বেচ্ছা-ক্রীতদাসী, নিজেকে যে অবিশ্রান্ত ঝরিয়ে দেয়, নরম পশলার পর পশলার; নীরবে, গোপনে যে চেঁচু খেলিয়ে যার প্রিয় পুরুষের জীবনের উপর দিয়ে, তার রক্তের ভিতর দিয়ে—অক্ষকার, উষ্ণ স্রোতে।

হৈমন্তী মৃণালকে কাছে টেনে নিলেন, তাকে জড়িয়ে ধরলেন নিজের জীবন দিয়ে। আর এই দুই স্ত্রীলোকের মধ্যে এক অদৃষ্ট ভাবাহীন বাণী-বিনিময়; তারা যেন অনেক আগেই পরস্পরকে বুঝে ফেলেছে। ডিমের খোলশের মধ্যে অজান্ত পাখির মত তারা আত্ম-সম্পূর্ণ—সেই তাদের মনোহীন, শারীর স্ত্রী-জগতে। কেননা

সূর্যমুখী

মেয়েরা শুধু শরীরই বোকে, শুধু শরীরকেই ভালোবাসে। তাদের সঙ্গে আমাদের শুধু শরীরের বিজ্ঞাৎ-সংস্পর্শ; অল্প বেদিক দিয়েই আমরা তাদের সঙ্গে মিলতে যাই, সেটা খানিকটা গায়ে-পড়া, খানিকটা মন-গড়া ব্যাপার। মিহিরের মনের জীবন—তার ভাবনার, কল্পনার, কবিতার জীবন—তার উপর হৈমন্তীর এতটুকু টান নেই, কোনো কোতূহল নেই তা নিয়ে। সে-জীবন যদি মূল পর্য্যন্ত শুকিয়ে মরে যায়, তিনি তা জানবেন না; যদি পল্লবিত হয়ে ওঠে ইন্দ্রধনু-ঐশ্বর্য্যে তবু তিনি কিছু বুঝবেন না। তাঁর ভেলে ভালো কবিতা লিখতে পারছে কি না পারছে তা নিয়ে কোনো ভাবনা নেই তাঁর। তাঁর চোখে ছেলের কবিতার যদি কিছু অর্থ থাকে তা শুধু এই যে একটা-কিছু নিয়ে সময় তো কাটাতে হবে, আর এতে যদি ওর মন ভালো থাকে এ-ই বা মন্দ কী? মিহিরেরা যেটা আসল জীবন, যেখানে সে কবি, সে শিল্পী, সে সীমাহীন—অনুভবে আন্দোলনে ব্যাকুলতায় সেই তার অস্পষ্ট ছায়াময় সমুদ্র-জীবন—সেখানে মায়ের হাত থেকে সে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন; সেখানে সে চিরন্তন নিঃসঙ্গ; সেখানে কোনো মাতৃমাংস থেকে তার সৃষ্টি হয়নি—সেখানে সে আত্মজ, আত্মসম্পূর্ণ, চরম। হৈমন্তীর এমন ক্ষমতা নেই সেখানে মুহূর্তের জন্য একটু উঁকি দেন। সে-ইচ্ছাও নেই। শুধু ছেলের শরীরের জীবন নিয়েই তাঁর ভাবনা—দিন থেকে দিন, প্রতি মুহূর্তে নিজের হাতে যে-জীবনকে তিনি সৃষ্টি

সূর্য্যবুধী

করেছেন। সেখানেই তিনি ছেলেকে বোঝেন—নিজেকে দিয়ে
 ছেলেকে ভরে' তুলতে পারেন সেখানেই।

মৃণালকে তিনি দীক্ষিত করলেন সেই শারীর জীবনের
 রহস্তে। বেনি বর্ষবার ধরকার হ'লো না, সে প্রস্তুত হ'য়েই
 ছিলো। সে-ও তো মেয়ে। কী-রকম রান্না মিহিরের প্রিয়,
 মশারি কতটা উঁচু না হ'লে তার ঘুমের বাধাত হয়, চাঁ সন্ধ্যা
 সে কী ভয়ানক খুঁতখুঁতে—ইত্যাধি, ইত্যাধি, আর তার সঙ্গে
 ব্যবহারের, ভঙ্গির অসংখ্য খুঁটিনাটি, যা বাদ দিলে সমস্তই
 অর্থহীন—একটু বিশ্বাস হ'য়ে ওঠে। শুধু করলেই চলে না;
 করবার রকমটা জানতে হয়—সেটাই আসল। সেখানে যদি
 কোনোরকমে একটু সুর কাটে, সব যায় নষ্ট হ'য়ে। আর মিহিরের
 কাছে অবিশ্রি তার মা-রই হচ্ছে মেরেলিতম মেয়েদ্ব : পৃথিবীর
 অস্ত্র কোনো মেয়ের সাধা নেই সেই তৃপ্তি, সেই শাস্তি তাকে দিতে
 পারে। মৃণাল সেটা বুঝতে পারলে তার প্রবৃত্তি দিয়ে। তাই
 সে হৈমন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো সন্ধ্যার, পূজার দৃষ্টিতে।
 নিবিড়ভাবে সে আসক্ত হ'য়ে পড়লো তাঁর প্রতি—সারাদিন সে
 আছে তাঁর পিছনে, তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে। সব সময় যে কোনো কথা
 হ'তো তা নয়, হ'জনের মধ্যে নীরবতার পরিপূর্ণতা। আর কথা
 যখন হ'তো—সেই সব তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ জিনিস নিয়ে, যা নিয়ে
 মেয়েরাই কথা কইতে পারে। হৈমন্তীর জীবন সে নিজের করে'

সূর্যাস্ত

নিলে। কিছুদিনের মধ্যেই মিহির টের পেলো যে তার জীবনের হাত বদলি হচ্ছে। তার প্রাত্যহিক জীবনের প্রতি মুহূর্তের নেপথ্যে রয়েছে মৃণাল। খেতে, বসতে, ঘুমাতে, কাপড় ছাড়তে সে হেঁচট খেয়ে পড়ছে মৃণালের উপর। মা-বেন খানিকটা দূরে সরে' গেছেন। মাকেও সে বেন দেখতে পাচ্ছে মৃণালের ভিতর দিয়ে। মা তো সব সময় তাকে নিয়েই ব্যস্ত, মা-র জীবনের খানিকটা বেন মিশে গেছে তার সঙ্গে। নিজে'কে তিনি বেন দিতে চাচ্ছেন এই মেয়েরই ভিতর দিয়ে। কিন্তু এ তো তিনি নন। মিহির একে চায় না। তার রাগ হ'লো, অভিযোগ জমে' উঠলো মনে। তার মনে হ'লো, মৃণাল বেন মা-কে কেড়ে নিচ্ছে তার কাছ থেকে: নিজে'কে সে কেবলই ছড়িয়ে দিচ্ছে তার স্বীকৃতির গর্বে, নিজে'কে দিয়ে সব ভরে' তুলছে—তারই জন্তু বেন সে মা-কে হারাতে বলেছে। অসহ—এই আত্ম-প্ররোচিত উদ্ধত স্বীকৃতি।

আসলে কিন্তু মৃণাল শান্ত, অত্যন্ত শান্ত, কানায়-কানায় ভরা দীঘির কালো জলের মত স্তব্ধ। কথা সে কম বলে; বাড়ির মধ্যে নানা কাজ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়—নীরব, ছায়াময়। বিড়ালের মত নিঃশব্দ তার চলাফেরা। হৈমন্তীর প্রতি তার আত্মগত্যা অনেকটা বেন পোষা বিড়ালের অশ্রুট, রেশমি আলক্তির মত: তার সমস্ত শরীরে পোষ-মানা পশুর শান্ত, নরম হাব-ভাব। বড়-বড় উজ্জল তার চোখ—রাত্রির অন্ধকারে বিড়ালের চোখের মত। সব

সূর্য্যমুখী

সময় সে বেন সম্পূর্ণ দৃষ্টি হেলে' তাকিয়ে আছে।' কেমন একটু
অস্বস্তিকর—তার সেই শুদ্ধ, উজ্জ্বল দৃষ্টি। মিহির কখনো ভালো
করে' তার দিকে তাকালো না। সে বধন ঘরে আসে মিহিরের
চোপ বইয়ের উপর। সে বধন দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় মিহির
চোপ না-তুলে বলে—'কী?' তার দিকে না-তাকাবার চেষ্টার
মিহির নিজেকে প্রায় অসুস্থ করে' তুললো। তবু এক-এক সময়,
হঠাৎ তার চোপ মৃণালের চোখের উপর গিয়ে পড়তো—বিস্ফারিত,
উন্মীলিত সেই চোপ। মৃণাল হিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো—সে-ই
'নিতো চোপ নামিয়ে। আর তার স্বীর শুধু এইটুকুই রইলো তার
মনে—উজ্জ্বল, শুদ্ধ সেই চোপ, রাত্রির অন্ধকারে বিভ্রান্ত চোখের
মত।

মৃণাল লেপাপড়া শেখেনি, ভালোবাসতে শিখেছিলো। তার শাস্ত, স্নেহ, রেশমি ধরণে। বিড়াল যেমন করে' পায়ের কাছে জড়ো-সড়ো হ'য়ে বসে, যেমন করে' রেশমি ভঙ্গিতে পায়ের নিচে তার উষ্ণ শরীর এলিয়ে দেয়। এর বেশি কি এর চাইতে অন্তরকম কোনো ভালোবাসা সে ভাবতে পারতো না। তার স্বামীর মনে প্রেমের যে-কল্পনা—পৃথিবী থেকে স্বর্গের সীমা পর্যন্ত রঙিন নদীর মত প্রবাহিত সেই বিরল ইন্দ্রধনু, তা সে বুঝতো না। তার কথা কেউ তাকে বলেনি, সে জানতো না ও-রকম কিছু মানুষের জীবনে আছে। সে বই পড়েনি, কবিতা পড়েনি : শিশুকাল থেকে সে শুধু জেনেছে বেঁচে থাকবার কঠিন, নিষ্ঠুর প্রয়োজন। সে সময় পায়নি ভালোবাসা সম্বন্ধে মনের কোনো ধারণা সংগ্রহ করবার, কোনো কবির স্বপ্ন থেকে, শব্দের কোনো সর্প-স্বপ্ন জাহ্ন থেকে। তার মন নগ্ন, শূন্য—কোনো ভাবনার সূর্যাস্ত-মেঘে তা বিলসিত নয়। সে শুধু জানতো ভালোবাসার অপ্রতিরোধ্য, নিষ্ঠুর প্রয়োজন—তার রক্তে, তার নিশ্চেতনতায়। বর্ষের নারীর মত দৃষ্টিহীন, প্রহীন, উত্তপ্ত তার আত্ম-সমর্পণ। তার স্বামীর কবি-খ্যাতি সে শোনেনি : তার স্বামী কী আর কী নয়, সে-সব ব্যাপারে তার প্রবৃত্তিগত উদাসীনতা। পুরুষ কিছু করবে, কিছু হবে এ তো জানা কথা—কিন্তু সেখানে তো, সেখানে তো জীব সবে তার

সূর্যমুখী

মিলন নয়। সে আসবে তার জীব কাছে দিনের কাজের পরে—
রাজির অন্ধকারে, রাজির নীরবতার : সে তাকে খুঁজবে রাজির
সেই সঙ্গোপন, উত্তপ্ত অস্তঃপুরে, তাকে নেহেম্যনির্ভরচর্চনীয় নীরবতার
সেই রাজিতে। সে তার গহন, নির্জন রাজি-সভা—সেখানে
সে তার জীব। জীব সেখানে ফুটে উঠবে পাপড়ির পর পাপড়িতে
আশ্চর্য্য নামহীন কোনো কুলের মত, সেই বিশাল, নির্জন অন্ধকারে,
প্রতিটি পাপড়ি প্রাণ-স্বাত, শরীরের বিরলতম, নিভৃততম সুরার
সিদ্ধি।

তা-ই মৃণাল জানতো। এত কথা অবিজ্ঞি তার মনে হ'তো
না, কিন্তু এ-ই সে অনুভব করতো : এরই জন্ত নিজেরই অজ্ঞাতে,
এই পরিপূর্ণতারই জন্ত নিজের মধ্যে সে নিবিড় হ'য়ে উঠেছে।
যে-সূর্য্য আঁধুরকে ভরে' তোলে, সে তাকে জানে না ; মৃণালও
জানতো না কোন্ অদৃষ্ট, ভীষণ শক্তি রয়েছে তার উচ্চ-স্পন্দমান,
সুরা-সঞ্চারমান বক্ষের নেপথ্যে। জাগ্রতভাবে সে তার শরীর
সম্বন্ধে সচেতন ছিলো না ; কিন্তু, কী যেন, কোনো অশ্লষ্ট,
অদৃষ্টভাবে সে যেন তাকে জানতো। তার শরীরের সঙ্গে তার
জীবনের এক ছন্দোময় প্রবাহ। অদৃষ্ট, অন্ধকার প্রোত্যের মত
তার শরীর-চেতনা। তার শরীর—তা-ই তার মহান উপহার,
তার যজ্ঞের উৎসর্গ, তা-ই নিয়ে সে এগেছিলো : আর-কিছু তার
ছিলো না। আর আশ্চর্য্য সে-শরীর, বসন্তের লতার মত,

সূর্যাস্ত

অলস দীপনিধার মত । অগ্নিময় তার শরীর, যৌবনময় : কোনো গোপন, হিংস্র আঙনে আঙুলের ডগা পর্যন্ত উন্মোচিত । গোপন, লুকোনো আঙুন, তার রক্তের মধ্যে কোনো অন্ধকার ঐশ্বর্য : তার চামড়ার পড়েছে তারই ছায়া । সেই গোপন আঙুনই তো তাকে কালো করেছে, শূন্য দিগন্তে বিশাল রাজির মত সেই রহস্য : প্রাণের উত্তাপে সে কালো, প্রাণের লাষণো অস্ত্রময় । দীর্ঘ, সবল তার বাহ ; তার নাসারন্ধ্রে প্রথর অমূল্যবলীলতা : তার উর্দ্ধচুড় বক্ষের নির্ভীক বক্রিমা । কিন্তু এই সমস্ত শক্তি নেপথ্যে রয়েছে, নিহিত রয়েছে—সে ভালো করে' তা জানেও না । এই সমস্ত শক্তি অপেক্ষা করছে কোনো পুরুষের, কোনো স্বামীর । সেই স্বামীর রাজিতে তা কুটে উঠবে, তারা হ'য়ে উঠবে । অলস, চিরন্তন তারা । এখনো মৃণাল রয়েছে শান্তিতে শিগিল, আচ্ছাদনে অস্পষ্ট, পোষ-মানা পশুর মত নরম ।

কিন্তু রাজি বক্র্যা, রাজি পাথরের মত বোবা । কুল পড়ে' রইলো, সমস্ত রাজি ভরে', কুটে ওঠবার অপেক্ষায় । আশ্রয়, নামহীন সেই কুল ! কিন্তু অন্ধকার কেটে পড়লো না গোপন সূর্য্যো, অন্ধকার কথা করে' উঠলো না । পাথরের মত বোবা অন্ধকার, পাথরের দেয়ালের গায়ে রাজি নিষ্পেষিত । মৃণাল চূপ করে' রইলো । কিছু করলে না, কিছু ভাবলে না । মনে-মনে ভর্ক করলে না, দীর্ঘশ্বাস ফেললে না, ভাগ্যকে একবার

সূর্যাস্থী

দোষ দিলে না। মেনে নিলে। স্বামীকে মেনে নিলে স্বামী বলে'ই; কোনো অস্বভাবের তাকে বিশ্বাস করলে পর্য্যন্ত। মেয়েমানুষের একনা' যখন বিয়ে হ'লো' যায়, সমস্ত তর্কের শেষ মীমাংসা তো সেখানেই। তার উপর আর-কোনা কথা চলে না। তারপর কেবল মেনে নিতে হয়, কেবল বিশ্বাস করতে হয়।

কেননা মিহির তার সমস্ত মনকে পাখর করে' তুলেছিলো। 'খানিকটা চেষ্টা ক'রে', ইচ্ছার সাহায্যে। সে মনে-মনে তার রাগকে পুবেছিলো—যেন খানিকটা আদর করে', ভালোবেসে। সে-ই তো তার ইচ্ছার নিশান, এই রাগ। তার নিজস্বের খানিকটা ভাঙাচোরা, বিকৃত ব্যঙ্গনা। ইঁ্যা, এই রাগকে সে ভালোবাসতো। কিন্তু তাকে সে গোপন করতো পরম চেষ্টায়, প্রকাশে কখনো উড়তে দিতো না সেই নিশানকে। মা-কে সে কিছু বুঝতে দেবে না। এই তার প্রতিশোধ মা-র উপর, পরম প্রতিশোধ এইজন্মে যে তিনি তা জানবেন না। তিনি বা চেয়েছিলেন, তা-ই হয়েছে। মাতৃ-ইচ্ছার অস্বভাব আর-কিছু তিনি ভাবেন নি। বেশ, এইবার ছেলের পালা। এইবার সে নিজের মনে উপভোগ করবে তার ছোটখাটো ঠাট্টা। সে ঠকাবে, ঠকাবে—প্রতি দিন প্রতি বৃহস্পতি ঠকাবে, তিনি তা জানবেন না।

সূর্যাস্থী

জীব প্রতি তার প্রথম প্রতিক্রিয়া বেন খানিকটা শারীরিক বিকর্ষণ গেছে। যেমন কোনো-কোনো লোক দেখা হওয়া মাত্র কাছে টানে, ঠিক তেঁইনি, মৃণাল বেন তাকে দূরে টানলে। তার একমাত্র ইচ্ছা হ'লো দূরে যেতে, দূরে সরে' যেতে। আর এই ভাব কাটিয়ে ওঠবার কোনোরকম চেষ্টা সে করলে না; কখনো মৃণালের দিকে চেয়ে দেখলে না, তাকে দেখলে না। সে যেন খানিকটা এই রকমই ভেবে রেখেছিলো, এটাই আশা করেছিলো। সে দূরে সরে' রইলো—ঠাণ্ডা, সাদা বিচ্ছিন্নতায়। সত্যি, এ-মেরের সঙ্গে কোথায় তার এতটুকু মিল? সে অস্ত-এক জগতের, অস্ত-এক গ্রহের। তার জীবনের আকাঙ্ক্ষা রাস্তা কোনো-একটা মোড়েও এর জীবনকে কেটে যায়নি। সে কবি, সে স্বপ্নবিলাসী : তার মনের ভাবনার মেঘে-মেঘে ছনের সোনার রঙ ধরে। সে বা ভাবে, সে বা অনুভব করে—আ, সেই সব কণিক, পলাতক আলোর টুকরো—সে কথায় ধরে' রাখতে পারে তার কতটুকুই বা। কল্পনার সেই রহস্যময়, অপরিণীত আকাশ—সেখানে তার মন পাখা মেলে দেয়, পাখা মেলে দেয়, উড়ে চলে' যায় বিগস্ত থেকে বিগস্তে,—ছরাশা থেকে ছরাশায়। তার মধ্যে এই মেরেকে সে দেখবে কেমন করে? কত বড় আলো তার চোখের সামনে, অনেক কাছের জিনিস তার চোখে পড়ে না। দেখতে না-পাওয়াই হয়-তো দরকার। আর

সূর্যাস্ত

যদি সে-সব জিনিষের মধ্যে কোনো জী পড়ে, যায়...তা হ'লে
কী আর করা।

অথচ জীলোকের মোহ সম্বন্ধে মিহিরের মন একটু বিশেষ রকম
দুর্বল—যেমন সব কবিরই হ'য়ে থাকে। 'আমার প্রাণের' পরে
চলে' গেলো কে বসন্তের বাতাসটুকুর মত ? কে ? কী হবে
খোঁজ নিয়ে ? কী হবে জেনে ? তুমি যে-ই হও, তুমি বয়ে' যাও
আমার প্রাণের উপর দিয়ে বসন্তের বাতাসের মত। আর-কিছু
আমি চাইনে। চোখের চকিত আলো কি ভুরুর একটু টান কি
বাহর অলস কোনো ভঙ্গি—কি দূর থেকে জানলার দেখা ছবি কি
হঠাৎ হাতের উপর একটু রেশম-স্পর্শ—যে-কোনো, যে-কোনো
জিনিস, যাকে ঘিরে আমার কথা বুনে যাবে তার রঙিন আল।
হোক তা মুহূর্তের, আমার এই কথাও তো মুহূর্তের ফুল। তুমি
বয়ে' যাও বসন্তের বাতাসের মত ফুল ফুটিয়ে দিয়ে, ফুল ছিটিয়ে
দিয়ে। আর-কিছু আমি চাইনে।

এই হচ্ছে সব কবির মনের কথা, চিরকালের কথা।
জী-জাতির তারাই হচ্ছে সব চেয়ে বড় উপাসক; কিন্তু সেই
উপাসনার কতখানি গর্ভ, কতখানি স্বার্থপরতা তা বুঝতে পারলে
কোনা মেয়ে তার কবি-প্রেমিককে কাছে আসতে দিতো না। কবির
হৃদয়ের মত এমন প্রবঞ্চনা আর-কিছুই করে না। সহজে সেখানে
রঙ ধরে, সহজে মুছে যায় : রেখে যায় সময়ের সমুদ্রে টলোমলো

সূর্যাস্ত

একগুচ্ছ কণিক। সেই রঙটাই তারা চায়, ভালোবাসতে চায় না।

না—এ-ও ঠিক বলা হ'লো না : ভালোবাসতেও চায় বইকি, ভালোবাসতেও পারে। কিন্তু আগে রঙ দর চাই। যে-রঙ কখনো ওঠে কবিতার কুলে-কুলে, তাই জ্বমে-জ্বমে একদিন হয়-তো গড়ে তোলে প্রেমের আশ্রয় উজ্জল মণি। কিন্তু যেখানে যে-রঙ নেই, যেখানে হঠাৎ বসন্তের হাওয়া বনে এসে লাগে না, সেখানে তাদের উদাসীনতার, অন্ধতার সীমা নেই। সেখানে তারা দেখতে পার না।

এমনি মিহিরের। তার মনের মধ্যে কোনোখানে ছিলো ভালোবাসার বিশাল, হ্রস্ব বাসনা—হ্যাঁ, ভালোবাসাই তো—তা ছাড়া আর কী নাম দেবো? এবং এটা সে জানতো যে তা সহজে হবার নয়। না, সহজ তা নয়। তাকে খুঁজে বেড়ানো যায় না, ইচ্ছার দ্বারে তাকে পাওয়া যায় না। তার জন্ত অপেক্ষা করতে হয়—অদিম, গভীর ঘৈর্যে। তার জন্ত প্রার্থনা করতে হয়, সূর্য দেবতার কাছে। আর মিহির প্রার্থনা করতো—তার জীবনের নির্জনতায়, তার কবিতার সেই রাত্রি-উৎসে। সে বিশ্বাস করতো একদিন সে পরিপূর্ণ হবেই। সে তা অস্বপ্ন করতো তার আশ্রয় গভীরতম স্তরে। সব সময় যেন তার মনে হ'তো—কোনোখানে, কোনো-এক ঘরে অপেক্ষা করছে তার জন্ত।

সূর্যমুখী

তার নাম সে জামে না, কিন্তু তাকে দেখলেই চিনতে পারবে।
 এখনো মাঝখানে রয়েছে অদৃষ্টের আড়াল। একদিন ছিঁড়ে
 বাবে সৈ-বাধা, মুহূর্তে অলে' উঠবে সমস্ত আকাশ, কোনা সংশয়
 থাকবে না। এ না-হ'রেই পারে না : সে যদি এমন করে' চাইতেই
 পারে, তা হ'লে স্বপ্নাটী এমন কী আশ্চর্য্য। না, সেটা ভেমন
 আশ্চর্য্য নয় ; সব চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে সে এমন করে' চাইতে
 পারছে। কেননা এ-চাওয়াতে ছুঃখ অনেক। কেবল চূপ করে'
 থাকতে হয়, নিজের নিভৃত আত্মার। আর-কিছু করবার নেই।
 অনেক ছেড়ে দিতে হয়, অনেক হারাতে হয়। বিশ্বাসের প্রচণ্ড
 জোর দরকার। জীবনে ক্লান্তির, অবসাদের মুহূর্ত আছে—
 সেগুলোকে কাটিয়ে উঠতে সত্যিকারের সাহস দরকার। এমন
 মুহূর্তও হয়-তো আসে যখন মনে হয় ও-সব ঠিকি, ও-সব কিছু
 নয়—তাকে পরাস্ত করবার জন্য খানিকটা সঞ্চিত শক্তি না হ'লে
 চলে না। আর সবার উপর, যা নিকট, যা প্রত্যক্ষ, যা
 সহজ—তাকে প্রতি মুহূর্তে ছেড়ে যেতে হয়, ছাড়িয়ে যেতে হয়।
 তবে যদি দেবতা দয়া করেন।

আর সেইজন্য মিহিরের কাছে মৃণাল নিতান্তই অবাস্তব,
 অর্থহীন। কোনোরকম আমলে আনবার মতই নয় সে। সে এত
 বেশি প্রত্যক্ষ, এমন নিতান্তই কাছে! তার মধ্যে এতটুকু কোনো
 আড়াল নেই যার ঠাঁকগুলো সে তারা দিয়ে ভরিয়ে তুলতে

সূর্যমুখী

পারে। তার মধ্যে নেই কোনো দিগন্ত-ইঙ্গিত, কোনো অদৃশ্য আকাশে বলাকায় পাখা-স্বাপটানির শব্দ। উন্মোচন করো, আবরণ উন্মোচন করো—তোমার মুখ দেখতে দাও। এ-ই হচ্ছে পুরুষের প্রার্থনা, প্রতি পুরুষের আত্মায় নিহিত করিব। তোমার মুখ দেখতে দাও, হে রহস্যময়ী, তোমার ঘোমটা সরিয়ে নাও। লগ্ন-অবগুণ্ঠনবতী সেই দেবী—তার পূজার পুরুষের আত্মা জলে ওঠে লাল শিখার মত, বীরের হাতে ঝড়ের মত। কিন্তু মৃণালের মুখে যে কোনো ঘোমটা নেই—নিজেকে সে যে নিঃশেষে প্রকাশ করে' হয় তার শরীর দিয়ে—যেটুকু তার দেখা যায়, সে তা-ই, তা ছাড়া কিছু নয়। প্রতিমার বিভূতি তার মধ্যে নেই : সে সীমাবদ্ধ পুতুল। চিরকাল ধরে' তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না : প্রতি মুহূর্তের নতুন আলোয় সে অপরিপক্ব নয়। তাকে নিরে মিহির কী করবে, কেমন করে' দেখবে তাকে ?

মিহিরের মত স্বভাবের লোক হয় নিজেকে ভালোবাসার উজাড় করে' দেবে—তখন সাবধান, হে কুমারী, লজ্জাজড়িত, আরক্তকপোল, অক্ষুটবাণী যুবতী, সাবধান !—না হয় থাকবে দূরে সরে', নিজের গোপনতার আবরণ। সে কখনো চেষ্টা করে', জোর করে' ভালোবাসবে না ; কখনো তাড়া করবে না, ফন্দি আঁটবে না, তৈরি করতে চাইবে না। সে বরং প্রেমহীন, হৃৎকের জীবন কাটিয়ে যাবে ; কিন্তু তৈরি-করা ভালোবাসা—না, না, সরে' গেলেও

সূর্যাস্থী

নয়। তা বেন খুটে ওঠে নিজেরই ভিতর—থেকে—আকস্মিক, অকারণ, হুর্সোখ্য, যদি কখনো তা হবার হয়। তাকে হ'তে দাও, তাকে না-হ'তে দাও, জোর করে' তাকে হওয়াতে যেয়ো না। আর সেইজন্য জীব প্রতি তার অনতিক্রম্য বিমুখতা, উদাসীনতা। আমাকে একা থাকতে দাও, আমাকে স্পর্শ কোরো না : কেনিরে-তোলা মনের ক্লেদাক্ত সংস্পর্শ থেকে আমার রক্ষা করো, দেবতা। জী, তার জী—ভাবতে হাসি পায়। সে তার জী, সে তার জী, সে তার। তার ! স্থগিত, বিবাক্ত কথা। একজন মানুষ কেন আর-একজনের হবে ? তোমরা বলতে পারো, তার কি কোনো কারণ আছে ? না, এ-মুতুতা তার কাছে চলবে না। কোনো মানুষ তার, এ-অপমান সে সহ করবে না। সে মুক্ত থাকবে, সে থাকবে পবিত্র। যাকে সে নিজের করে' নিতে পারে না, সে তার—এ কেবল অপমান নয়, এ তো নিছক যন্ত্রণা। নীরবে, গোপনে মিহির যন্ত্রণা সহ করতে লাগলো।

এমনি তাদের বিবাহিত জীবন। মিহির লুকিয়ে রাখলো তার যন্ত্রণা, তা প্রকাশ করার কোথায় বেন একটা স্থান সন্ধান করল। সেটা তার লজ্জা, তা দেখাতে গেলে লজ্জা বিগুণ হ'য়ে উঠবে। যাকে সে ভালোবাসতে পারে না, তাকে আঘাত করতে গেলে নিজেরই কাছে ছোট হ'য়ে যেতে হয়। সে তা পারে না। যাকে ভালোবাসা যায় না তাকে দূর, অন্তত, করতে হয়—নয় তো

সূর্যাস্ত

আত্ম-সম্মানে বা লাগে। তাই মৃণালের প্রতি তার বাইরের ব্যবহারে খানিকটা প্রশ্রয়, খানিকটা সহিষ্ণুতা—বেমন ব্যবহার আমরা করি শিশুর প্রতি, গোষা জানোয়ারের প্রতি, আর্থিক কারণে সম্পূর্ণ আমাদের অধীন কোনো মানুষের প্রতি। বাইরের আবহাওয়া শান্ত, নিস্তরঙ্গ—হঠাৎ দেখলে স্থবোধ বলে 'ভুল হ'তে পারে। কিন্তু ভিতরে সব কাঁকা, শূন্যময়, পাখরের দেয়ালের মত বোবা সাজি।

যে-কোনোরকমের দেখানোপনাকে মিহির ভয় করে। তাকে অবজ্ঞাকেও সে কোনো কঠিন, নির্দিষ্ট রূপ দেখে না। তাকে ভাসতে দেবে হাওয়ার, প্রেতের নিঃশ্বাসের মত, অনিশ্চিত, অঞ্চল অনস্বীকার্য প্রেত-উপস্থিতির মত। ঠিক জায়গায় গিয়ে তা ঠিকভাবে লাগে, কিন্তু বাইরে কিছু বোঝা যায় না; বাইরে সব সমতল, মন্থণ। আর তার মা-কে মনে রাখতে হয় সব সময়েই। কোনো প্রশ্ন তাকে যেন শুনতে না হয়, কোনো জবাবদিহির দায় যেন তার উপর না পড়ে। তাই মাঝে-মাঝে, বিশেষ করে' মা যখন কাছাকাছি থাকতেন, সে মৃণালের সঙ্গে একটু এটা-ওটা আলাপ করতো, সাংসারিক কোনো তুচ্ছতা। হয়-তো এমন কথাও জিজ্ঞেস করতো: 'আজ তোমাকে এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন?' কি 'চুলগুলো শুকোতে পারো না ভালো করে?' না, কপটতা নয়; দুর্বলতা—হয়-তো। অসুস্থতিনিীল মনে বিমুখতার

সূর্যমুখী

জন্ম লক্ষ্য। তালোবাসবার অক্ষমতার উপর আচ্ছাদন। যার সঙ্গে এক বাড়িতে সব সময় বাস করতে হচ্ছে তার সঙ্গে কোনো স্পষ্ট, রুঢ় ব্যবধানের যত অস্বস্তি আর-কিছু নেই : সেটাকে যথাসাধ্য কমিয়ে আনা।

মৃণাল মানানসই জবাব দিতো—মৃহস্বরে, সোজা তার স্বামীর মুখে তাকিয়ে। মেন হঠাৎ কিসের সুর লাগতো তার কণ্ঠের। সে-ও কি বুঝতো এই খেলা, এই নাটক, তার নিজের ভূমিকা ? যা-ই হোক, কোথাও আটকে যেতো না, মন্থন সমতলতার কোণ বেরিয়ে পড়তো না কোথাও।

আর রাত্রে—মিহির অনেক রাত জেগে পড়াশুনো করে। নীল চাকনা-দেয়া টেবুল-ল্যাম্পের নরম আলোর সঙ্গীর্ণ চক্রে মথ্যে তার আনত মাথা। হাতের কাছে ছাইবানে আগানো সিগ্রেট, তা থেকে ফিকে নীল ধোঁয়া পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে উঠে উপরের অন্ধকারে নিলিয়ে বাচ্ছে। ঘরের ভিতরের দিকে পাংলা অন্ধকার, খাটের উপর মশারি ফেলা। সেখানে মৃণাল ঘুমিয়ে। ঘুমিয়ে ?—হ্যাঁ, তা-ই তো, কারণ বিছানার দিক থেকে অসুটতম কোনো শব্দও কখনো আসে না। সমস্ত দিনের কাজের পরে ক্লান্ত, বালিশে মাথা রাখা মাত্র মৃণাল ঘুমিয়ে পড়ে। কখনো যদি তার শুয়ে-শুয়ে ঘুম না আসে, কখনো যদি সে খোলা, কালো চোখে কালো অন্ধকারের ভিতরে তাকিয়ে থাকে, তা জানবার উপায় নেই। মিহির

সূর্যাস্ত

যখন শুভে যায়, সে-তাকে দেখে গভীরভাবে নিমজিত। সে-সময়ে তারও চোখ জড়িয়ে আসে ঘুমে, তার ভিতর দিয়ে মৃণালের অম্পট, আবছারা মৃষ্টি সে দেখতে পায়—ঘুমে এলানো, ঘুমে অন্ধকার। শুনতে পায় তার গভীর, নিরমিত নিঃশ্বাস। খাটের এক প্রান্তে সে লীন, বিছানার প্রায় সমস্তটা মিহিরের দখলে। আর, একটু পরে সে-ও ঘুমিয়ে পড়ে, সেকেলে মৃন্মার সেই প্রকাণ্ড, ভারি খাটে, তার মা-বাবার বাসর-শয্যা, যার উপর ছেলেবেলায় সে গড়াতে ভালোবাসতো, বড় হবার পর থেকে প্রত্যেক রাত্রি যার উপর সে ঘুমিয়েছে। সে উঠতো ঘেরি করে, 'মৃণাল উঠতো' ভোরের প্রথম আলোর সঙ্গে। মৃণাল কখন উঠতো, সে একদিনও তা টের পেতো না।

ছায়ার মত চুপচাপ, ছায়ার মত মুহূর্তকারী, মৃণাল তার কাজ নিয়ে চলাফেরা করে সারাদিন ভরে। এক মুহূর্ত তাকে বিশ্রাম করতে দেখা যায় না। আর মিহিরের অসংখ্য নিশ্চেষ্টন প্রয়োজন একজন জীলোকের সমস্ত সময় নিযুক্ত রাখবার পক্ষে বখেটে। অতাব হ'লে সে-সব চোখে পড়ে, মিটলে খেরাল হয় না। মৃণালের সমস্ত প্রাণের ছন্দ বেন করে-ঝরে' পড়তে লাগলো সেই-সব কাজে—তা-ই দিয়ে ভরে' উঠতে লাগলো তার কীতদাসীর আত্মা, তার মায়ের-আত্মা। নিজে'কে সে ডুবিয়ে দিলে মিহিরের বহির্জীবনে, গৃহ-জীবনে : সেই গৃহের সঙ্গে এক হ'য়ে উঠলো সে।

মৃত্যুবৃত্তী

মিহির তার মা'র হাতে যেমন ছিলো, তেমনি রইলো ; কোনো প্রভেদ লক্ষ্য করতে পারলে না । কোনো অদৃষ্ট হাত চাইবার আগেই তার সমস্ত অভাব মিটিয়ে যাচ্ছে—চিরকাল যেমন হচ্ছে । বে-সব জিনিস সে খেতে ভালোবাসে, তা-ই আসছে ঘুরে-ঘুরে, স্নান, প্রীতিকর বৈচিত্র্যে ; যতই ঘেরি করে' সে খেতে বলুক, ভাত বেন এই একটু আগে উঠুন থেকে নামানো হ'লো । রোজ বিকেলে হাতের কাছে পাওয়া যাচ্ছে সাদা জামা-কাপড় ; আর জামার বোতামগুলো সব সময় ঠিক জায়গাতেই আছে । চায়ের জঁজ্ঞ এঁকবারও ডাকতে হয় না, খাওয়া হ'য়ে গেলে বাসন-গুলো এক মুহূর্ত পড়ে' থাকে না টেবিলে ; ছাইদানিতে এক ঘণ্টার ছাই জমে' উঠতে পারছে না । মৃণাল ঝাড়ছে আর ধুচ্ছে আর ঘষছে—ঘরের দেয়াল আর মেঝে, আসবাব আর আয়না, জানলার কাচ আর কাঠ ; বিছানা টেনে নিয়ে মেলে দিচ্ছে রোদদূরে, আবার টেনে আনছে ; বাধকমে নিয়ে কাচছে ওয়াড় ; কখনো হয়-তো চাকরের মত জুতো বুরুশ করছে—চাকরটা কাছে দাঁড়িয়ে ইঁ করে' দেখছে—তার ছুই দীর্ঘ বছর তজিতে বেন অজল, প্রবল প্রাণ উজ্জলিত হ'য়ে পড়ছে । তার বেন ধখেঁট করবার নেই—নিজেকে সে ছড়িয়ে দিতে চায়, আরো, আরো ; আরো নিকিড় করে' এই বাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে যেতে চায় । এই বাড়ির নুক আশ্রায় সঙ্গে তার নুক আশ্রায় নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ । কোনো অকৃত,

স্বর্গস্থানী

অচেতন অধিকারে এই বাড়িকে সে নিয়েছে—হু'হাত ভরে', সমস্ত জীবন ভরে' নিয়েছে। এখানে সে গেয়েছে তার শাস্তি। এই বাড়ি আর এ-বাড়ির মধ্যে যা-কিছু আছে সব তার দখলে—তার শাস্ত নীরবতার অন্তর্গত। এ-সব কাজেই তার সন্তার পরিপূর্ণতা, তার আনন্দ—বে-আনন্দ মিহিরের, চাঁদের দিকে তাকিয়ে। তার বাহর সবল ভঙ্গিতে সেই আনন্দের স্রোত, সৃষ্টির স্রোত। সৃষ্টিশীল স্রোত—অন্ধকার উত্তাপে বয়ে' যাচ্ছে সমস্ত বাড়ির ভিতর দিয়ে। ক্রীতদাসী-আত্মার উত্তপ্ত অন্ধকার স্রোত।

আর কী? বে-জন্ত বিয়ে করা তা তো হ'লো; তা তো পরিপূর্ণ মাত্রাতেই হ'লো। হৈমন্তীর হাতে এখন এত কম কাজ যে মাঝে-মাঝে তিনি হাঁপিয়ে ওঠেন। সময় কাটাবার জন্ত নিতান্ত নিম্নরোজন ঘ্রিনিল তাঁকে সেলাই করতে হয় বসে'-বসে'। মিহিরের বুকের মধ্যে আর ধাক্কা লাগে না—তার মা-র কালো-হ'য়ে-আলা মুখের শীর্ণতা বেধে। নিজেকে আর অপরাধী মনে হয় না এই জীলোকের কাছে, যার প্রাণ-রস প্রতি মুহূর্তে শোষণ করে' তার এই নবীন শরীর-তরু।

—নিজেকে অপরাধী মনে হয় বই কি, কোনো স্মরণভাবে, স্মৃত জীলোকের কাছে, মৃণালের কাছে। এ না হ'য়ে মা হ'লেই বেন ভালো ছিলো। পুরুষের জীবনে কোনো দাসী বহি না থাকলেই নয়, সে-দাসী মা হ'লেই সব চেয়ে ভালো। সেখানে কোনো

সূর্য্যমুখী

কৃতজ্ঞতার, কোনো ব্যক্তির বোঝা নেই ; সেখানে মুক্তি । থাকে ভালোবাসি তার প্রতি নিষ্ঠুর হ'লেও মানায়, তার প্রতিই নিষ্ঠুর হওয়া যায় । নিজের জন্ত তার সমস্ত প্রাণ নিঃশেষে নিঙড়ে নেয়াও ভালো ; তা যদি অপরাধ হয় সে ভালোবাসারই অপরাধ, অপরাধ করবার অধিকার ভালোবাসারই আছে । কিন্তু থাকে ভালোবাসিনে, সে যখন সমস্ত প্রাণ শরীরের শিকড়ে-শিকড়ে সঞ্চারিত করে' দেয়—তা প্রত্যাখ্যান করবার উপায় থাকে না—এমন নৃশ, অনিচ্ছিতে তার গতি, এবং অনিবার্য্য তার প্রয়োজন—এবং তা লক্ষ করাও সহজ নয় । সেটা মনের উপর একটা ভার—কৃতজ্ঞতার মৃত দ্যুপ । সব চেয়ে বিস্ত্রী এই কৃতজ্ঞতা—কেন একজনকে বাধ্য করা হবে আর-একজনকে মনে করে' রাখতে ? কিছু নিরে যদি তোলা না যায় তা হ'লে না-নেরাই ভালো—যদি লজ্জা হয় । ভুলতে পারাই মুক্তি । আর তা না হ'লে, সেই ভার হালকা করবার জন্ত ভেঁকে আনতে হয় শীর্ণ খেত দয়াকে—রক্তহীন প্রেত । কী অত্যাচার আত্মার উপর—যরা করবার এই নীরক্ত খেত প্রয়োজন ।

হয়-তো কোনো বিকেলে, একটু-একটু করে' চায়ে চুচুক দিতে-দিতে মিহির বই পড়ে, মৃণাল ঝাড়িরে থাকে পাশে, নীরব, অপেক্ষমান, স্বাধীর খাওয়ার মধ্যে অকৃত্রিম আবিষ্ট । তাকে টের পাওয়া যায় না, তাকে লক্ষ্য করবার দরকার করে না । মিহিরের কোলের উপর বই : জান হাত দিয়ে পাতা ওন্টাতে-

স্বৰ্ণমুখী

কণ্ঠাতে বা হাতে সে হঠাৎ কামড় দেয়, লালী মুড়মুড়ে ঝড়ো
 ভেঙে পড়ে পাতার মাঝখানকার কীকে—তা ঝড়বার জন্তে আস্তে
 সে একবার ঝুঁ দেয়। আস্তে-আস্তে সে খায়, অর্দ্ধ-চেতন, অর্দ্ধ-মনা,
 যেন তার কোনো তাড়া নেই—যেন শরীরের মধ্যে চারের উক
 লক্ষীরের সঙ্গে-সঙ্গে কাব্যের উদ্দীপনা অনুভব করতে-করতে সে
 কাটিয়ে দেবে চিরন্তন বিকেল। সেই তারু হুজি, তার স্ময়তা,
 তার সত্যার পরিপূর্ণতা। হু'জনের পরিপূর্ণতা চলতে থাকে
 লম্বাক্তরাল শ্রোতে—কেউ কাউকে ছোঁয় না।

তবু হঠাৎ হঠ-তো, টি-পটের ঢাকনা তুলে আরো চা আছে
 কিনা দেখতে গিয়ে কি সিগ্রেট ধরাতে গিয়ে—হঠাৎ মিহিরের
 খেরাল হয় যুগলকে। যুগালের তুচ্ছ, আত্ম-বিস্মৃত হুজির দিকে
 তাকিয়ে তার ধারাপ লাগে, কেমন একটু রাগ হয়। অস্ত্রার—
 নিজেকে এমন করে' অপসৃত করবার কী অধিকার তার আছে ?
 এই অপসৃতিতেই তার নিহিত শক্তির বিস্তার। মিহিরের অবস্থি
 লাগে। বহি সে হু'একটা কথা কইতো, তা হ'লে ভিতরে-ভিতরে
 এই চাপা অবস্থি জমে' উঠতো না।

‘বোসো না’, তার মুখের দিকে না-তাকিয়ে মিহির বলে,
 ‘এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছো।’

‘তোমার খাওয়া হোক, বাসনগুলো নিয়ে বাই।’

‘নিরে বাও।’

সূর্যমুখী

‘চা তো আরো আছে।’

‘নিচ্ছি ঢেলে। তুমি—তুমি তো চা খাও না। একেবারেই খাও না?’

‘অভ্যেস নেই।’

মিহির তার শেষ পেরালা ঢেলে নেয়। আলাপ এগোয় না। সত্যি, বলবার জুঁ কিছু নেই। হয়-তো মৃণাল তা আশাও করে না। হয়-তো সত্যি তাকে দয়া করবার প্রয়োজন নেই। মিহির তাকে দেখছে তার নিজের আলোর, নিজের ভিতর থেকে, সেই অস্ত তার সন্ধ্যাচ। নিজের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে মৃণালের হয়-তো অন্তরূপ। সে-ও হয়-তো নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ, মিহিরের মত—অন্ত-কোনো শক্তিতে, অন্ত-কোনো শক্তিতে।

মৃণাল তার স্বামীর তত্ত্বরতার দিকে তাকিয়ে থাকে—কেমন এক-রকম গভীর, নিঃশব্দ ধরণে—নির্নিমেষ নিঃশেষ সেই দৃষ্টি! যখন সে পড়ে, যখন সে লেখে, যখন সে চুপ করে বসে থাকে, যখন হঠাৎ লেখা ছেড়ে উঠে ঘরের মধ্যে সে পারচারি করে। যে-অসহ্য অমৃতভূতিতে, যন্ত্রণার মত দে-জাননে মিহিরের আত্মা আলোড়িত, তা সে জানে না। সে কিছু জানে না, কিছু বোঝে না: সে শুধু দেখতে পারে, শুধু ভাবে। এটাই যেন ঠিক, মিহির যে তাকে দেখতে পাচ্ছে না, কিছুই যে দেখতে পাচ্ছে না; তার কাছে যে তার কোনো অস্তিত্বই নেই, এটাই যেন ঠিক।

সূর্যাস্ত

এই বিলুপ্তিই যেন মৃণালকে কেমন করে' ভরে' তোলেন। মিহিরের নিবিড় নিবন্ধ কৃশ মুখ—যেন ভিতর থেকে কোনো আলোর উদ্ভাসিত—সুদূর, হ্রস্বোদ্য, স্পর্শাতীত, কোনো সুদূর দেবতার মুখের মত। কোনো সুদূর দেবতা—মৃণালের শরীরের রূপটি থেকে পূজার ঘোঁরা উঠছে তার দিকে ; স্তবগানের মত স্তম্ভিত তার রক্তের স্রোত ; তার সমস্ত প্রাণ সে তুলে ধরছে, সে লুটিয়ে বিচ্ছেদ একটি সম্পূর্ণ অঙ্গুলির মত। বলা, দেবতাকে কে স্পর্শ করবে—এই সুদূর, বিহ্বল, নিভৃত দেবতা। শুধু নিঃশব্দ নিঃশ্রমেব জুড়িতে তাকিয়ে থাকা, শুধু পূজার করে' পড়া। কখনো রাত্রে মৃণাল ঘরে এসে বেথে টেবুল-ল্যাম্পের লক্ষীর্ণ আলোর চক্রে মিহিরের আনত মাথা, তার মুখের খানিকটা ছায়ায়, সমস্ত আলোটা পড়েছে তার কালো, কৌকড়া চুলে। আলোর সেই লক্ষীর্ণ চক্রে সে আবদ্ধ, সম্পূর্ণ—কোনোখানে আর-কিছু নেই। চারদিকে সে নিঃশব্দতা দিয়ে ঘেরা, নির্জন রাত্রি দিয়ে ঘেরা। সেই রাত্রির সীমানার অন্ত-কোনো পৃথিবী—সেখানে চিরকালের রহস্য। আর সেই নিভৃত কৃশ মুখের দিকে তাকিয়ে, মৃণাল ভরে' যায় রহস্যে আর আতঙ্কে—সে জানে না, নির্জন রাত্রির সীমানার কী আছে, তা সে জানে না। ভাবতে পারে না। শুধু তার মধ্যে ঐ বিশাল রহস্যের অঙ্ককার। অঙ্ককারের ভিতরে সে মিলিয়ে যায়, ছায়ায় মত।

সূর্যমুখী

স্বামীকে সে কখনো মন দিবে জানতে চায় নি। তার মনকে
 ন কেলে রেখেছিলো রহস্যের অন্ধকারে। সে জানতো যে মিহির
 গথে, কিন্তু যা লেখে তা উন্টিয়ে দেখবার ইচ্ছা তার কখনো
 রনি। তা যেন বাহ্যিক ; দূর থেকে চুপ করে' যে তাকিয়ে থাকে,
 তারই ভিতর দিয়ে তো সে নিজেকে নিঃশেষ করে' দিচ্ছে—অগ্নি-
 ক্ষুর ধরকার নেই। মিহিরের টেবিলের কাগজপত্র নিয়ে সে
 খনো নাড়াচাড়া করতে না, ঘেরাজ খুলতো না কখনো।
 কবার সে ভুল করেছিলো, প্রথম দিকে, না জেনে। সমস্ত
 রের শৃঙ্খলা সম্পাদন করে' সে শুছিরে রেখেছিলো মিহিরের
 গথার টেবিল, বইপত্র ইত্যাদি। কিন্তু, সে বুঝতে পারলে, মিহির
 চায় না। স্পষ্ট করে' সে কিছু বলেনি, কিন্তু মৃগাল তার চোখের
 কে তাকিয়েই বুঝতে পেরেছিলো। সমস্ত বাড়ির মধ্যে এই
 কটুখানি জারগা মিহিরের, নিছক স্বঘের চাইতে গভীরতরো,
 গীতরো কোনো অর্থে তার। এখানে সে অস্ত্র কাউকে হাত দিতে
 বে না। সুতরাং এর পর থেকে সমস্ত ঘর স্বকথক করছে,
 ক্ষ মিহিরের টেবিলে সেই চিরন্তন বিশৃঙ্খলা।

কারণ সেই বিশৃঙ্খলা মিহির ভালোবাসতো। সেটা তার
 হাজার হাতের কাজ, সেটা তাকে দিয়ে ভরা। সে-ই যেন
 ডিরে আছে এলোমেলো কাগজ-পত্রে, নানারকম বেকারদার কেলে
 থা বইয়ের স্তুপে। এর জন্য সে নষ্ট হ'তে দিতে পারে না।

সূর্যমুখী

মাহুকের জীবনে কিছু থাকার দরকার, বা একমাত্র তাঁর, একান্তরূপে তার। তার নিঃসঙ্গ, গোপন কোনো সত্তা ; এমন একটা জায়গা যেখানে সমস্ত পৃথিবীর মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেয়া যায়। তালোবাসার জোরেও কেউ সেখানে ঢুকতে পারে না, কেবল তালোবাসা যেখানে বসেই নয়। এমন কি, প্রচলিত অর্থের তালোবার দরকারও করে না। সেই নিঃসঙ্গতার দরজা কেবল তার কাছেই খুলে দেয়া যায়, যার সঙ্গে আশার সুরের মিল। যার সঙ্গে এক ছন্দে আমার রক্তের প্রবাহ। সে-রকম মাহুকের জীবনে বেশি পাওয়া যায় না, ছ'একজন পেলেই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতে হয়। অত্যন্ত বিরল, মুকো-ছিটোনো করেকটি মুহূর্ত বাধ দিয়ে, দরজা বন্ধই থাকে—বন্ধ থাকাই উচিত। মৃণাল সমস্ত বাড়ি ভরে নিজেকে ছড়িয়ে দিক, কিন্তু সেখানে দরজা বন্ধ। মিহির তার নিঃসঙ্গতা নিয়ে যা করে, মৃণাল নিজস্ব বাইরে থেকেও তা ছুঁতে পারবে না। সে যে তার কাগজপত্র ইত্যাদি শুছিয়ে রাখবে এটুকু আক্রমণ, এটুকু সংস্পর্শ পর্য্যন্ত মিহিরের কাছে অসহ্য।

কোনো রাতে, বন্ধুদের কোনো আড্ডা থেকে ক্লান্তে মিহিরের ঘেরি হ'তো। এলে যেখতো মা-র ঘর অন্ধকার, মৃণাল একা বলে আছে চুপচাপ, হয়-তো হাতে কোনো শেলাই। তাকে যেখে সে উঠে দাঁড়াতো, আন্তে-আন্তে যেতো রান্নাঘরের

সূর্যমুখী

দিকে। আর মিহিরের গলা পর্যন্ত বেন হঠাৎ রাগ ঠেলে উঠতো—এই ধৈর্যের মুক্তি, এই জন্ম-দালী, নির্ঝাঁক গোব-মানা এই স্ত্রী-পশুকে বেধে।

‘তুমি এখনো খাওনি?’

মৃণাল চুপ।

‘তুমি এখনো খাওনি?’

‘না।’

‘কেম খাওনি?’ এতক্ষণ না-থেরে তুমি বসে’ আছো কেন? কে তোমার বসে’ থাকতে বলেছে?’

‘কেন? এতে দোষ কি?’

‘আছে দোষ। আমার এ-সব ভালো লাগে না।’

‘আমার ভালো লাগে।’ মৃণালের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত শান্ত, তাতে এতটুকু প্রতিবাদের স্বর নেই: যেটা নতি, তা-ই বেন অত্যন্ত গহনভাবে বলছে। মুহূর্তের জন্য মিহিরের চমক লাগে। একটু অবাক হ’রে তার দিকে তাকায়। একবার সে কী জবাব দেবে? তবু, তার রাগের বাষ্পগুলো উঠছে ঠেলে, তারই বৌকে সে বলে’ কেম:

‘ভালো লাগা উচিত নয়। এককম তুমি আর স্বরতে পারবে না।’

‘তা হ’লে কী হবে?’

সূর্যমুখী

‘কী আবার হবে—ভাত চাপা দিয়ে রাখবে এ-ঘরে !’

‘আর তা-ই তুমি খাবে ?’

সোজা, সরল প্রশ্ন, কিন্তু মিহিরের মনের মধ্যে খোঁচা লাগে। তার মনে হয় মৃণাল বেন তার দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছে, তাকে আটকাতে চাইছে তার নিজেরই দুর্বলতার জালে। ওঃ নারী, নারী ! কল্যাণী, মূর্তিমতী করুণা, ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমাদের খাওয়ার জন্ত, ঘুমের জন্ত, আরাধের জন্ত, সুখের জন্ত ভাবনার জন্ত নেই তোমার। কিন্তু সেই ছলনার, তার সুযোগ নিয়ে তুমি আমাদের আটকাতে চাও ; আমাদের দুর্বল করে’ দিয়ে সেই দুর্বলতাকে করে’ তোলো তোমার হাতের অস্ত্র। তুমিও আমাদের জড়াতে চাও, আমাদের আত্মাকে জড়াতে চাও। তুমিও রক্ত-শোষক—বদিও তা টের পাওয়া যায় না, আর সেটাই সব চেয়ে ভয়ানক। অনেক, অনেক ভালো মোহিনী, মায়াবিনী ইত্যাদি, যুকের উপর যুখ রেখে যে রক্ত-শোষণ করে—তার মধ্যে, আর যা-ই হোক, কোনো কপটতা নেই। মায়াবিনীর ক্ষুধিত, লাল অধর কোনো মিথ্যে কথা বলে না। আর তুমি শুভ্র, তুমি পবিত্র, হে কল্যাণী, অলঙ্কিতে, অজ্ঞাতে তুমি আমাদের জড়াও, তোমার মেহে, তোমার করুণায় ; আমাদের আত্মাকে উপড়ে আনতে চাও তোমার করুণায়, কল্যাণের হৃদয়, নরম হাতে। হে কল্যাণী, নিত্য আছো আপন গৃহকাজে। কিন্তু গৃহকাজ

মৃত্যুমুখী

নিরেই তুমি থাকো; তার বাইরে আর এসো না; তোমার গৃহকাজের হৃদয় তত্ত্ব দিয়ে পদে-পদে আমাদের লিঙ্গ কোরো না, আমাদের বাধিত কোরো না—দূরে থাকো। তোমার বিরল পুষ্পতবনে দূরে থাকো। তোমার আশ্রয়শাথে কোকিলের ডাক আর তোমার শিশুর কলঙ্কনি—সব তুমি রাখো; কিন্তু আমার আত্মাকে ছেড়ে যাও, আমার আত্মাকে ছুরো না।

একটু চুপ করে' থেকে মিহির বলে: 'না—ও-রকম তুমি আর কোরো না'। খামকা না-থেকে বলে' থাকবার কোনো দরকার নেই।'

মৃণাল কিছু বলে না, তার মুখ বেখে মনে হর কথাটা সে মেনে নিয়েছে। কিন্তু এর পরে যে-রাত্রে মিহিরের কিসতে ঘেরি হয়, মৃণাল তেমনি বলে' আছে, চুপ করে', কোলের উপর হুঁহাত জড়ো করা, কি হাতে কোনো লেলাই। রোজ এক কথা বলতে মিহিরের ভালো লাগে না; একটি কথা না-বলে' সে খেয়ে নেয়। ক্রমে এমন হ'লো যে তার আর রাগ হয় না। লক্ষ্য করতেই সে ভুলে গেলো। সে মেনে নিলে—মৃণালের অন্তরাজ কাজ, সমস্ত মৃণালকে সে যেমন মেনে নিয়েছে। মৃণাল সবচেয়ে তার মনের এমন আগ্রহও নেই যে বেশি রাগ করা যায়।

এমন অসুস্থমান করা যেতে পারে যে এই বিয়ে থেকে বসন্তটা মুখ পাবার, তা পেয়েছিলেন হৈমন্তী। তিনি যা চেয়েছিলেন তা-ই হ'লো। আর মৃণালের নির্বাচন যে তাঁর কতটা ঠিক হয়েছিলো সে হৃদিনেই তার প্রমাণ দিয়েছে। মৃণালের মধ্যে হৈমন্তী মনের শান্তি পেলেন। এ-মেরেকে বিশ্বাস করা যায়, এর উপর নির্ভর করা যায়।

তবু, কোথায় যেন একটা অতি সুন্দর চিড়। বাতালে যেন কী। আজকালকার ছেলেমেয়েদের এই কি প্রণয়ের ধরণ—তিনি ভাবলেন। হৃদয়কে এক সঙ্গে তিনি মাঝে-মাঝে লক্ষ্য করতেন—কিছু কি ধরা পড়তো, কিছু কি বোঝা যেতো? না, আঙুল দিয়ে দেখানো যায়, এমন কিছু নয়। শুধু, কোনো হঠাৎ হাওয়ার, অস্পষ্ট একটা পরদা কালো উঠতো চোখের সামনে। রাত্রে বিছানার তরে-তরে হৈমন্তী ভাবতেন, সেই অস্পষ্ট পরদাকে টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়তেন মনে-মনে। আর হঠাৎ একটা দারুণ ভরে তাঁর হৃৎপিণ্ড সজ্জিত হ'রে যেতো—যুগ্ম তিনি ভুল করেছেন।

কী ভয়ানক, অস্ত্রের জীবন নিয়ে কোনো ভুল করা! কেন আমরা অস্ত্রের জীবন নিয়ে ভালো-মন্দ কিছু করতে বাই? যে যার জীবন নিয়ে যেমন খুশি করুক—সে-ই তো সব চেয়ে ভালো।

সূর্যাস্ত

আর হৈমন্তীর মনে বজ্রপাত মত একটা কথা ঘোঁড় দ্বিগুণে উঠতো :
এ তো তাঁরই জন্তে, তাঁরই গরজে । নিজের আগ্রহে অন্ধ হ'য়ে
কি তিনি...তা-ই বা কেন, বিয়ে তো সবাইকেই করতে হয়—আর
কখনো যদি করেই, তা হ'লে এখন কেন নয় ? তা ছাড়া, মিহির
কি বলতে পারতো না—যদি ওর বলবার কিছু থাকতো । যুক্তি
বিষে খুঁজে-খুঁজে তিনি কোনো দোষ দেখতে পান না । তবু !

একদিন তিনি ছেলের কাছে গিয়ে বললেন : 'তুই মাঝে-মাঝে
বৌকে নিয়ে একটু বেড়াতে গেলেই পারিস্ ?'

উত্তর দেবার আগে মিহির মা-র চোখের দিকে একটু তাকিয়ে
রইলো । বিয়ের পর থেকে মা-র সঙ্গে তার কেমন একটা ব্যবধান
গড়ে' উঠছিলো । মৃণাল চাপা দ্বিগুণে তার মা-কে । প্রতিদিনের
নানা ছোটখাটো প্রয়োজনের ভিতর দ্বিগুণে তাঁকে আর পাওয়া
যায় না । দিনের বেলায় মা তার খাবার কাছে এসে বলেন ;
সমস্ত দিনের মধ্যে সেই সময়টুকুতেই তাঁর সঙ্গে তার বা কথাবার্তা ।
তাও সে-রকম নয়, আগেকার দিনে যেমন হ'তো । কোথায় বেশ
বাধা । মৃণালের উপস্থিতি মাঝখানে ।

বেশ, তা-ই হোক তবে । এ অবস্থা তো মা-র নিজেরই হাতের
তৈরি । তিনিই এটা চেয়েছিলেন, তিনি এতে খুঁসি । এখন
আর কিছু বলবার নেই । নিজেকে সে আন্তে-আন্তে সরিয়ে
আনলে মা-র কাছ থেকে । তার মনের মধ্যে একটা বোঝা

সূর্যমুখী

ফোঁড়। আ—কেন সে তার মা-র সুখের কথা ভাবতে গিয়েছিলো ? সুখ দিয়ে কী হয় ? মা-কে সে খাটাতে-খাটাতে ঘেয়ে ফেলতে পারলে না কেন ?

তার মনে হ'লো, যেন কতদিন পর আজ মা-কে ভালো করে' দেখলো। আর হঠাৎ একটা বিষেবের ধাক্কা পাংশ হ'য়ে গেলো তার মুখ। তাই ! তার মা এখন এসেছেন তাকে দিয়ে মৃণালকে ভালোবাসাতে। এতেও তাঁর ভৃগু হরনি। 'তার আত্মার উপর তাঁর অপ্রতিরোধ্য অধিকার—এবং তিনি ঐ জানেন। সেই অধিকার তিনি খাটাবেন তাঁর মরজি-মত'। তাকে তিনি বাঁকাবেনই তাঁর অন্ধ ইচ্ছার চাপ দিয়ে-দিয়ে। তার উপর তার মা-র ইচ্ছার নির্ভুর পাষাণ-নিষেধণ—তা ছাড়া তার বিয়ে আর কী ? অস্তায়, সব চেয়ে বেশি অস্তায় এই কারণে যে আঘাতটা পড়েছিলো তার হৃদয়বৃত্তিতে, যেখানে সে সব চেয়ে দুর্বল। নিছক প্রবঞ্চনা—কিন্তু জীলোক সব পারে। সম্পূর্ণ জেনে-ওনে একটা বাঁধর-নাচ সে নেচেছে। তাতেও হবে না—আরো একটা বাঁধরামো তাকে করতে হবে। ভালোবাসতে হবে তার জীকে। সত্যি ?

একটু চুপ করে' থেকে সে বললে, 'কেন, ওর শরীর ধারাপ হচ্ছে নাকি ?'

'শরীর ধারাপ না-হ'লে সুখি মানুষের বেড়াতে যেয়োতে নেই ?

সূর্যমুখী

দিনের পর দিন বাড়ির মধ্যে বদ্ধ হ'য়ে কাটাতে ভালো লাগে কারো ?

‘বদ্ধ কেন বলছো ? এমন স্বাধীনতা আর কোথায় ? তা ছাড়া, ভালোও ওর লাগে । অল্প কোথাও গেলেই ভালো লাগবে না ।’

‘কী করে’ জানলি ?

জানি । যার বা ভালো লাগে তাকে তা করতে দেয়াই হচ্ছে মনুষ্যত্ব । তুমি কেন জোর খাটাতে বাবে ?

হৈমন্তী ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন দুর্ভাগ্যবান । তাঁর দৃষ্টি জিজ্ঞাসার নকশিত । মিহিরের কথার সুর তাঁর ভালো লাগলো না । অনেক কথা একসঙ্গে তাঁর মনে হ'লো ; কিন্তু তিনি চট করে’ কিছু বললেন না, পাছে ভুল কথা বলে’ ফেলেন । অঙ্ককার তিনি রেন হাতড়ে কিরছেন, বেরোবার পথ খুঁজে-খুঁজে ।

মিহিরই আবার বললে : ‘তা ছাড়া এতে এমন-কিছু এলেও বার না । তুমিও তো বাড়ি বসে’ই দিন কাটাও ।’

‘আমার সঙ্গে ওর কী কথা ?’

‘নয়ই বা কেন ? তুমি বা পারো, ও কি তা পারবে না ? না-পারতে দেখিনে তো ।’ বলে’ই, পাছে তার ভিতরের কোনো বিকোড, কোনো বিবেক কথার সুরে বেরিয়ে পড়ে, সেই ভয়ে :

‘অবিন্দি তুমি যদি বলো’ মুচকি হেসে হালকা সুরে সে বলে’

দুর্ভাগ্যবতী

উঠলো, 'ওকে নিরেও বেতে পারি বেড়াতে। যেখানে খুলি। যদি ভাগ্যক্রমে এমন হয় যে ও ভিক্টরিয়া বেমরিয়ল দেখেনি, তা হ'লে আর কোনো ভাবনা থাকে না। কেবল সব চাইতে জমজমাট শাড়ি পরবার অপেক্ষা।'

মিহির মৃদুস্বরে হেসে উঠলো। সেই হাসির ভিতর দিয়ে সে তার বিবকে ঢেলে দিচ্ছে রূপান্তরিত করে'। অকপটরকম হালকা গোছের কথা—তার বিরুদ্ধে কী বলা বেতে পারে? হৈমন্তী যেন কোণ-ঠাঙ্গা হ'য়ে পড়লেন। যদি হ'তো প্রকাশ্য বিরোধিতা তা হ'লে আলাদা কথা ছিলো: তা হ'লে ইচ্ছার সেই বুদ্ধে, আর বা-ই হোক, ছেলের মনের সমস্ত জড়ানো স্মৃতিগুলো খুলে-খুলে যেতো, হয়-তো চলে' আসতো তাঁর হাতের মুঠিতে, তারপর তিনি সেগুলোকে যেমন-খুলি নন্দার ফেলতে পারতেন। কোনোভাবে, তাঁর অস্পষ্ট স্ত্রী-আত্মার কোনোখানে তিনি জানতেন, ছেলের উপর তাঁর ভরসার অধিকার। একবার ভিতরে ঢুকতে পারলেই হয় কোনোরকম করে'। কিন্তু মিহির তুলে দিলে হাসির বেড়া, তাঁকে ফিরে আসতে হ'লো। সব চেয়ে বা ধারাপ লাগে তা এই যে হাসির উপরে কোনো কথা চলে না। তা নিয়ে প্রতিবাদ করতে গেলে হাস্যাস্পদ হ'তে হয় নিজেরই কাছে। নিজেকে তাঁর বিপর্যস্ত, ব্যর্থ মনে হ'লো।

থেকে-থেকে তিনি আনেন ছেলের কাছে, মৃণালের প্রলজ

সূর্য্যমুখী

নিয়ম : নতুন রকমের যে গুজরাতি সাড়ি বেরিয়েছে, মৃণালের
জন্ত তার একখানা কিনলে কেমন হয় ; বিয়েতে পাওয়া ছাইভস্ম
দিনি প্রসাধনের জিনিস কি ব্যবহার করা ভালো ; শোবার ঘরে
পরবার জন্ত ওর মখমলের এক জোড়া চটি হ'লে বেশ হয় ;
ওর আঙুলে নীলা-বসানো আংটি মানাবে বেশ । এমনি অনেক
গারে-পড়া, জোর-করে'-পাড়া কথা । মিহির ঐষ্য ধরে' শুনতো,
কীং হাসি তার ঠোঁটে । রাখতো তার মায়ের কথা ; কিনে
আনতো সাড়ি আর এসেজ্ আর আংটি । অথচ, যে-কোনোরকম
বাজার করতে চিরকাল তার বিস্ত্রী লেগেছে । তার গায়ের জামাও
হৈমন্তী বাড়িতে দরজি ডাকিয়ে পুরোনো জামার মাগে তৈরি
করাতেন—সে টেরও পেতো না । হৈমন্তী ঝড়ের জন্ত প্রস্তুত
ছিলেন ; হতাশ হলেন এমন প্রশান্ত বাধ্যতা দেখে । তিনি
কেবলই চেষ্টা করতে লাগলেন ছেলের মনের মধ্যে উঁকি দিতে,
তার কাছে আসতে, তাকে বুঠোর মধ্যে পেতে । বিশেষ
সফল হলেন না, যদিও ।

আর তিনি কেবলই ষোঁচা দিতে লাগলেন—যদি একদিন
সে সত্যি চটে' ওঠে, রাগের ঘোঁকে নিজেকে ধরা দিয়ে ফেলে ।
তিনি ঠিক সেই সব প্রস্তাব নিয়েই ছেলের কাছে যেতে-~~যাওয়া~~বার
সম্বন্ধে, তিনি জানেন, তার অনতিক্রম্য বিড়কা । যেমন এক
বিকলে তিনি হয়-তো বললেন :

সূর্যাস্ত

‘এই, বন্ধিমবাবুর কী-একটা বই ফিল্মে দেখাচ্ছে, ভালো
ভরেছে নাকি খুব। মৃণাল বেখে আসুক না আজ।’

‘নিশ্চয়ই। তুমিও যাও।’

‘তা-ই ভাবছি। নিরে যাবে কে?’

‘নিরে আবার যাবে কে? এখান থেকে এখানে যেতে পারবে
না? আমি না-হয় টিকিট এনে দিচ্ছি।’

‘তুইও তো যেতে পারিস।’

‘অসম্ভব।’

‘অসম্ভব কেন? চল না। মৃণালকে কাপড় পরতে বলি।’

‘তা কাপড় তো পরতেই হবে।’

‘তুইও তৈরি হ’য়ে নে।’

‘আমি যাবো না। তুমি তো জানোই সিনেমা দেখতে আমি
ভালোবাসি নে।’

‘একদিন না-হয় গেলিই।’

‘যদি’ গেলেও আমি বাঙলা ছবি দেখবো না।’

‘তা হ’লে আর আবারেরও যাওয়া হয় না।’

‘কেন?’

‘না, থাক।’

‘থাকবে কেন? যাও না তোমরা।’

হৈমন্তীর প্রত্যেকটি কথাই ছিল-করা দ্বন্দ্ব-পীড়ন। মিহিরের

সূর্যাস্ত

দাঁতে দাঁত লেগে আসছে, তবু তাকে শাস্ত হ'য়ে থাকতে হবে।
 ধৈর্যের পরীক্ষা, বলা যায়। ছ'জনের প্রতিরোধশক্তির প্রচ্ছন্ন
 বৃদ্ধ। কিন্তু মিহিরও হার মানবে না। এমন সে হ'তে দেবে
 না যে তার মা ফাঁকি দিয়ে তার উপর বাজি জিতে যাবেন। শেষ
 পর্যন্ত সে ধরে' থাকবে, নিজেকে টেনে রাখবে নিখুঁত মাত্রার
 মধ্যে : শেষ পর্যন্ত জিৎ হবে তারই।

তাই সে একটু পরে বললে : 'আমার জন্তই তোমাদের যাওয়া
 আটকে থাকবে কেন ? চলো, আমিও না-হয় বাজি।'।'

হৈমন্তী তখন উন্টোদিক দিয়ে আক্রমণ করলেন : 'ধাক,
 ইচ্ছে না-থাকলে গিয়ে কাজ নেই।'

'একদিন না-হয় দেখলুমই একটা বাঙলা ছবি।'

'দয়া করে' তোমার যেতে হবে না।'

স্বাভাবিক অবস্থায় হ'লে কথাবার্তা এতদূর এগোতো না :
 মিহির অনেক আগেই মা-কে চুপ করিয়ে দিতো। আর এখন,
 তার ইচ্ছে করছিলো চীৎকার করে' উঠতে, কিন্তু সে মুহূর্তে
 শুধু বললে :

'নিজের উপর দৃষ্টি করে'ই যেতে চাইনি।'

হৈমন্তী আন্তে-আন্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন—ব্যর্থতার
 ছবি। ছেলের বিরুদ্ধে তাঁর মনের এই অস্পষ্ট, ব্যর্থ আক্রোশকে
 তিনি কী করে' সস্থ করবেন, কী করে' গোপন করবেন ? আর

সূর্যমুখী

খানিক পরে, মিহির যখন আরনার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে, হঠাৎ মৃণাল এসে বললে :

‘তুমি কি বেরুচ্ছে ?’

‘তাবছিলুম একটু সিনেমার বাবো—তোমরা যদি যাও ।’

‘তা হ’লে না গেলে । আমরা কেউ যাচ্ছিনে ।’

‘যাচ্ছে না ?’

‘আজ তো নয় ।’

‘আচ্ছা তা হ’লে’, মিহির আরনার কাছ থেকে সরে এলো ।

‘যেদিন বাবে আমাদের বোলো ।’

সন্ধ্যাবেলায়, হৈমন্তীর ঘরের জানলার কাঁকে গুপকাঠি ঝেলে দিবে মৃণাল তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালো । বললে, ‘মা, ওর বা ভালো লাগে না, কেন তুমি ওকে তা করতে বলো ?’

‘ভালো না-লাগলে চলবে কেন ? ভালো লাগাতে হবে ।’

‘আমার তো কিছুই দরকার নেই ।’

‘কেবল দরকার বলেই বুঝি ? পুরুষমানুষকে খামকা মাঝে-মাঝে খাটিয়ে না নিলে ওদের মাথা ঠিক থাকবে কেন ?’

‘কিন্তু ও-সব ঝগড়া—ও তো ভালোবাসে না—’

‘ভালোবাসে না ! ও কী ভালোবাসে শুনি ? বে-কাজ ভালোবাসি, তা তো নিজের গরজেই করতে পারি । সেটা আর বেশি কথা কী ? বা ভালোবাসি নে, তা কেবল তার জন্তেই

স্বর্ঘ্যসুখী

করতে পারি, থাকে ভালোবাসি। পুরুষমানুষ বৌয়ের মত একটু
কষ্টাট সহিবে না ? তা কি হয় ? না, হ'লেই ভালো দেখায় ?

মৃণাল আর-কিছু বললে না, মুখ ফিরিয়ে নিলে। তার গলার
নীলব, নরম একটু রেখা হৈমন্তীর চোখে পড়লো, আর হঠাৎ তাঁর
মনের মধ্যে একটা সন্দেহ, একটা আশঙ্কা, ভয়—বুঝি তিনি ভুল
করেছেন, বুঝি তিনি ভুল করেছেন। ভয়ে তাঁর রক্ত বেন
সুকিয়ে গেলো। আর সেই ভয় তাঁকে হানা দিতে লাগলো, তাঁর
বিশ্রামে, তাঁর আরাগে, তাঁর ঘুমে। তাঁর সমস্ত চিন্তায়, তাঁর
শান্তিতে, তাঁর নির্জনতায়। তিনি লক্ষ্য করলেন, তিনি লক্ষ্য
করা ছেড়ে দিলেন। তিনি মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন,
তিনি চোখ সরিয়ে নিলেন। তিনি ছোটখাটো কথা থেকে
গভীর ইঙ্গিত বা'র করবার চেষ্টা করলেন, চেষ্টা করলেন নীরবতার
অন্তর্লীন স্বরকে ধরতে। কিন্তু কিছুতেই কোনো বীমাংলার
পৌছতে পারলেন না।

এমনি করে' কাটলো বর্ষা—বাঙলাদেশের এলোমেলো উত্তরোল উদ্ভাস্ত বর্ষা, বিরতিহীন, তৃপ্তিহীন; খেয়ালে ভরা, চঞ্চলভায় ভরা; বৃষ্টি ঝরিয়ে-ধেয়া, রোষ ছড়িয়ে-ধেয়া; আকাশ নীলের আর ধূসরের জোড়াতালি; আর্দ্র অন্ধকার আর কঠিন, শ্বেত দীপ্তির টানা-পোড়েন; চাপা কান্নার মত রাত; রাজির মত রুদ্ধশ্বাস, মেঘের হুপুয়; অজস্র, প্রগল্ভ, অশাস্ত; হঠাৎ লুটিয়ে-পড়া, লক্ষ্যার বিগল্ডে রঙে-রঙে অলে'-ওঠা; রাজির পথে-পথে নিঃসঙ্গ কুকুরের মত কঁকিয়ে-ওঠা হাওয়া; মোহময়, বিরহময়, ক্লাস্তিকর, অসহনীয়—আমাদের বাঙলাদেশের বর্ষা। আর সেবার তা আখিনে ভেঙে পড়লো, ঢেউ খেলিয়ে গেলো আখিন ভরে', নষ্ট করে' দিলে' বাঙলার বিখ্যাত আখিনকে। তা হাঁপিয়ে পড়লো, খাবি খেতে লাগলো, ফুরিয়ে এলো, ফিকে হ'য়ে এলো, তবু লে ছাড়বে না; তবু পূর্ণিমার জন্ত ভরে'-ভরে'-ওঠা পূজোর চাঁদের দুখ'লে শিঙ-তোলা মেঘের গুঁতোয় ভেঙে-ভেঙে দিতে লাগলো। পূজোর বিনগুলো ভরে' ছোট-ছোট পশলা, রাতে জ্যোছনার বজ্রা থেকে-থেকে কালো হ'য়ে আসে, যেন একটা ঘোমটা পড়ে সৃষ্টির সুখের উপর; আর পূর্ণিমার পরে ক্লকপক্ক যখন এলো, হঠাৎ আবার শ্রাবণ এলো ঘনিয়ে—মনে হ'লো এ-বৃষ্টি আর কখনো ধামবে না।

সূর্যসুধী

মাঝরাতে হঠাৎ নামলো বৃষ্টি। তুফান শ্রোতে তা নেমে এলো, কেউ বেন কোনো জিনিস ছুঁড়ে কেললে স্বর্ণ থেকে, বেন আকাশের একটা টুকরো চোচির হ'য়ে কেটে গেলো। রাজির সহরের বত অদ্বিত মিশ্রিত শব্দ, জন্মের আর যানের, কণ্ঠের আর ধাতুর, সব বেন যুহুর্ন্তে স্তব্ধ হ'য়ে গেলো; রইলো শুধু বৃষ্টির শব্দ, বহুধা বিবিড় একটানা বৃষ্টি, রাজি ভরে, আকাশ ভরে; সমস্ত বিশ্ব, সমস্ত সময় ভরে। বৃষ্টির ছাঁট এসে লাগলো মিহিরের আনত মুখে, অপরিসীম-স্বপ্ন কোনো আত্মার আদরের মত। বেখানে সে বসে' ছিলো টেবিলের উপর' কহুয়ের ভর রেখে, সেখান থেকে হাত বাড়িয়ে সে সারি বন্ধ' করে' দিলে। কেউ বেন বৃষ্টির মুখ চেপে ধরলে। কিন্তু তা ছটফট করছে, কাৎরাচ্ছে, গোঙাচ্ছে, কোশলে কোণঠাসা কোনো বস্ত্র জন্মের মত। তা পোষ মানবে না কিছুতেই। মিহিরের জানলার বাইরে তা মাথা কুটে মরছে। সমস্ত আকাশ কাঁপছে তার বিলাপে। নরম, নিরবচ্ছিন্ন এক শব্দ, কোণ-ঠাসা জন্মের প্রান্তিহীন দীর্ঘশ্বাসের মত, চেতনার খোলসকে বা দীর্ণ করে' যায়, দৃষ্টিকে বা আচ্ছন্ন করে অনিশ্চয়ের, অজ্ঞাত-উৎস কোনো স্রগন্ধের মত। জা বিষন্নতার ভরা, নিঃশব্দতার ভরা। মাহুবকে তা নিয়ে যায় শ্রুতি-অতীত সেই অন্ধকারে, যখন আদিম অরণ্যের গুহার বনে' বিশাল পল্লবের কীক দিয়ে মাহুব আকাশের তারা লক্ষ্য করেছে—আর রাজি ভরে' গেছে সমস্ত বিশ্বের মধ্যে তার নিঃশব্দতার চেতনার।

সূর্য্যমুখী

খিহির চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। তার মন বলবে না কিছুতে। হঠাৎ তার মনে সেই আদিম নিঃসঙ্গতা-বোধ। বৃষ্টি স্পর্শ করেছে তার আঁখিকে, বৃষ্টি প্রবেশ করেছে তার আঁখার মধ্যে। এই রাত্রির মত বিশাল অস্পষ্ট অন্ধকার বিবাহে সে আচ্ছন্ন। কী যেন নেই, কী যেন নেই। কোনো সময়ে, কোনো রাত্রির অরণ্যে সে তারার দিকে তাকিয়েছিলো—আজ তার মন ভরে উঠেছে সেই তারা-বিরহে। ঘরের চারদিকে সে তাকালো : আধো-অন্ধকারে রেখারিত তার শব্দা, দেয়ালের উপর আড়-হ'য়ে-পড়া ছারার পরদা—আর তার মনে যেন ভীষণ আদিম অরণ্য মর্ষরিত হ'য়ে উঠলো। সে যা অসম্ভব করলে তা অনেকটা আতঙ্কের মত—নিঃসঙ্গ জন্মের আতঙ্ক। তার যেন ভয় করতে লাগলো—রাত্রির এই অপমৃত্যু, দীর্ঘনিঃশ্বাসিত জগতকে ভয়। টেক্স-ল্যান্সের চাবিটা সে ঘুরিয়ে দিলে। ঘরের অন্ধকার ভরে বৃষ্টির শব্দ, যেন এক প্রোত-স্বর কেবলই কী কহিতে চাইছে—কহিতে পারছে না। কোনোখানে এক কোঁটা আলো নেই। চোখে না-দেখেও সে দূরতে পারলে বাইরের ঠাণ্ডা কালো আকাশ—আন্ত একটা পাখরের মত। সে ভাবতে পারলে না রাত্তার একটা আলো আছে, কোনো বাড়ির কোনো জানলার একটু আলোর রেখা। সমস্ত ভূবে গেছে, সমস্ত হারিয়ে গেছে, শুধু এই অবিশ্রান্ত নিরবস্থান শব্দ। অন্ধকারের মধ্যে হুড়হুড় করে' সে বিহানার গিরে

সূর্য্যবুধী

তুলো, শুহার মধ্যে কোনো ক্লান্ত জন্মের মত। বাগিসের মধ্যে মাথা ভুবিরে দিবে সে চোখ বুজলো। আর ঐ তো—বুড়ি বাজছে তার রক্তে দগদগ করে, ক্লান্ত হচ্ছে তার কংপিণ্ডে। বুড়ি, বুড়ি ! চিরন্তন অন্ধকারে চিরন্তন বুড়ি। সৃষ্টির শেষ দিনের মত, প্রলয়ের মত। আর তার ভয় করছে, একা থাকতে তার ভয় করছে। একা থাকার মানে কী, এর আগে সে যেন কখনো জানেনি। যা-কিছু একদিন তাকে আশ্রয় দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে, বিশ্বাস দিয়েছে—সব এই রাজির চাপে চূর্ণিত। তার নয় নিঃসঙ্গ, মনোহীন এই সত্তা—সে কখনো নিজেকে এ-রকম করে' ভাবতে পারেনি। তার চামড়ার নিচে, তার মাংসের অত্যন্তরে তা লুকিয়ে ছিলো এতদিন—এতদিন ধরে'। দিন আর রাজির শ্রোত তার উপর দিবে ভেসে গেছে, ঐকে দিবে গেছে ছবি, ভাবনার রঙে আর রেখার—এতকাল। সেই ছবিটাই ছিলো। হঠাৎ রাজির কোপের আড়াল থেকে কী লাফিয়ে পড়লো তার উপর, কী নেমে এলো তার উপর—কিছু যেন ছিঁড়ে গেলো, টুকরো হ'য়ে গেলো—আর ঐ তো সে জড়োসড়ো হ'য়ে জ্বরে আছে ভীত পত্তর মত, অস্বহীন রাজি গড়িয়ে বাচ্ছে তার উপর দিবে।

মিহির বেশিঙ্গ চোখ বুজে থাকতে পারলে না। চোখ বুজে থাকবার এই চেষ্টা, তা-ও যেন সহ হয় না। সে তাকিয়ে রইলো অন্ধকারের মধ্যে ; শুনতে লাগলো বুড়ির অস্বহীন শব্দ। আ—

সূর্য্যসুখী

কিছু নেই, সমস্ত পৃথিবীতে এছাড়া আর-কিছু নেই। এখানে সময়ের সীমা। এর মধ্যে একা থাকা—এই রাত্রিতে, এই অন্ধকারে! যেন একটা ঠাণ্ডা তার মেরুদণ্ড বেয়ে-বেয়ে উঠছে। সে কেঁপে উঠলো। এই রাত্রি চেপে বসেছে সময়ের বুকের উপর সর্কব্যাপী দৈত্যের মত; সময় থেকে সে স্থলিত হ'য়ে পড়ছে। এ-সময়ে কোনো আশ্রয়, কোনো সংস্পর্শ—বা দিবে সে জ্ঞানতে পারবে সে আছে। ঠাণ্ডার তার শরীর যেন জল হয়ে আসছে; তার কান, তার মন, তার সমস্ত সত্তা যেন বৃষ্টিময়। এই ঠাণ্ডা সে আর সহিতে পারে না, এই ভয়। আর, 'দৈ-অন্ধ উত্তাপ চায়, তার মত সে এগিয়ে গেলো সামনের দিবে, শুঁড়িছুড়ি হ'য়ে। সেই ঠাণ্ডা বিশাল শব্দা নিয়তির প্রসারের মত তার শরীরের নিচে। সে তা পার হ'য়ে এলো, সে হাত বাড়িয়ে দিলে অন্ধকারে। আর হঠাৎ এই সীমাহীন রাত্রির মধ্যে এ কী, এই উত্তাপের দ্বীপ! মিহিরের সমস্ত শরীর রোমাঞ্চে উদ্ভাব হ'য়ে উঠলো।

মৃণাল কি বুঝিয়ে ছিলো? মৃণাল কি অপেক্ষা করে' ছিলো? কিছু সে-ও অন্ধকারের মধ্যে চোখ খুললো; অন্ধকারের মধ্যে হ'জনের অন্ধ চোখ। আর মিহির মিশে গেলো, মিলিয়ে গেলো, মগ্ন হ'য়ে গেলো মৃণালের মধ্যে। নিজেকে সে ভরে তুললো মৃণালকে দিবে। মৃণাল অদৃষ্ট, প্রগাঢ় শ্রোতে তার মধ্যে সঞ্চারিত, মৃণালের উত্তাপ তার গোপন সূর্য্য, গোলাপের মধ্যে নিহিত

সূর্যাস্থী

অন্ধকার, উজ্জল সূর্য। আর সেই উজ্জতা মিহিরের অঁঠের
 হাথুকেসে, তার রক্তের মধ্যে কোনো অগস্ত বিবের মত। প্রতিটি
 অঙ্গুলিপ্রান্তে সে বিদ্যাময়। অন্ধকার ভরে' বিদ্যাৎশ্রোতে, এক
 সম্পূর্ণ বিদ্যাৎবৃন্তে তাহের রক্ত প্রবাহিত। 'মিহির শোষণ করে'
নিলে মৃণালকে, তাকে নিঃশেষে নিঙুড়ে নিলে নিজের মধ্যে,
 বতকণ না অন্ধকার সূর্য্য করে'-করে' পড়লো পাপড়িরপর পাপড়িতে,
 রাত্রিকে জাগিয়ে তুলে ; বতকণ না সমস্ত রাত্রি মর্মে-মর্মে, তন্তুতে-
 তন্তুতে বদ্ধ হ'য়ে উঠলো।

আর পরের দিন সকালে আকাশ রোদে-ঝলোমলো।
 বিছানার তরে-তরে মিহির দেখতে পেলো সেই আশ্চর্য্য আকাশ।
 আর হঠাৎ কোথা থেকে একটা তিক্ততার ঢেউ তার গলা পর্য্যন্ত
 ঠেলে উঠলো। না, এ সে চায়নি, এর জন্য তার রাত্রি প্রস্তুত
 ছিলো না। এ কীকি, কীকি। মৃণাল তাকে কীকি দিয়েছে,
 নিজেকে সে কীকি দিয়েছে। মৃণাল নির্ভর হ'য়ে উঠলো তার
 মন। মৃণাল তাকে নিয়েছে—কোনো কোণে, কোনো শঠতার।
 সে কী বোকা—নিজেকে এমনি দীর্ণ করতে গেলো—ছ'টুকরো
 করতে গেলো—তা শারীরিক অঙ্গচ্ছেদেরই মত ; নিজেকে তার
 মনে হ'লো বিকল, বিপর্য্যস্ত, অবমানিত। নিজেকে সে ছ'টুকরো
 করে' কেটেছে, বাতে একজন জীলোক মনে-মনে বলতে পারে :
 'সে আমার।' তুমি আমার! তুমি আমার! সব চেয়ে

সূর্য্যবুধী

স্থপিত কথা, কলুধিত, কলুধর ; যা তখনে প্রবল বিতৃষ্ণার শরীর
 নিরশির করে' ওঠে। কী করে' সে একজন স্ত্রীলোকের হাতের
 খেলার ধরা পড়ে' গেলো ! রাজির কিছুই তার ভালো করে' মনে
 পড়ছিলো না ; কিন্তু তার বিতৃষ্ণার নেশায় সে পরম অপরাধী
 করে' তুললো সৃণালকে। তাকে স্থণা করে'—যা একদিন সে
 কখনো করেনি—সে প্রতিশোধ নিলে নিজের আত্ম-বিভেদের,
 নিজের পরাজয়ের। কেননা এতে কোনো স্বীকৃতি নেই, কোনো
 ঐশ্বর্য্য নেই। এর কোনো মানে হয় না। এতে কেবলই ক্ষয়,
 কেবলই বিকলিত, নিজেকে হুঁটকরো করে' হিঁড়ি'-ফেলা। এর
 কোনো মানে হয় না। মিহিরের মনে হ'তে লাগলো তার
 আত্মার একটা অংশ সে হারিয়ে ফেলেছে—বিকিয়ে দিয়েছে,
 সৃণালের কাছে।

সারাদিন সে সৃণালের বুকের দিকে তাকাতে পারলো না।
 সে স্থণা করলো তার শাস্ততা, লম্বত বাড়ি ভরে' তার নিঃশব্দ
 নৈপুণ্য। তার মধ্যে সে আজ একটা নতুন আত্মস্থতা দেখতে
 গেলো : তার এই নীরব নির্মূল নৈপুণ্য ; প্রলীন, নিঃসঙ্কোচ
 বাধ্যতা—তা-ই যেন মিহিরকে সব চেয়ে বড় অপমান। সে বহন
 করছে একটা গোপনতা, তার নিষ্ঠুর, অনস্বীকার্য্য স্ত্রীত্ব। সে-ই
 তার চরম শক্তি, রাজি যার উৎস। সারাদিন ভরে নিজেকে অপন্থত
 করে রাখলেও তার কিছু এসে যায় না। রাজি আছে তার।

সূর্য্যবুধী

মিহিরের আত্মার একটা অংশ সে দখল করে' নিয়েছে—আর এমিকে ছাখো, পোবা বিড়ালের মত সে শান্ত, ছাখো তার অক্লান্ত নিখুঁত নৈপুণ্য !

তবু সেই রাত্রে মিহির তার প্রতিহিংসা নিলে। মৃণালকে 'অপমান করে', তার শরীরের তিতর দিয়ে তার আত্মাকে অপমান করে'। ঘুণার উল্লাসে সে তাকে স্পর্শ করলে। তাকে মুহমান করে' দিলে তার ঘুণার উত্তাপে। সে উজাড় করে' দিলে তার জীবন্ত, জলন্ত ঘুণা—মৃণালকে তা পেঁচিয়ে ধরলো চারদিক থেকে কোনো বিবাক্ত, মীল আগুনের মত। সে তাকে অপমান করলে, ছারখার করে' দিলে। নিজের স্বভাবের উপর, এই উরাবহ অত্যাচারে সে প্রায় মরে' গেলো : তবু, নিজেকেও সে দ্বন্দ্ব করলে না।

আর পরের দিন বিতৃষ্ণা, নিজের উপর প্রচণ্ড ঘুণা। আর বেহেতু সে-ঘুণার কারণ মৃণাল, তার উপর তীব্রতরো ঘুণা। তার ফলে আবার প্রতিহিংসা। এমনি করে' চললো—বিবাক্ত, অন্তহীন চক্রে। একটা ঘূর্ণ্যমান চাকা হঠাৎ তাকে ধরে' ফেলেছে কেবলই ঘুরে চলেছে, তাকে চূর্ণ করে', নিষেবিত করে'। সূর্য্য, অজ্ঞাত দেবতার কাছে মিহির প্রার্থনা করলো মুক্তির জন্য। কিন্তু প্রার্থনার স্বর রাজ্যের বুকের উপর মরে' গেলো। তার নিজের মাংসই যে অবাধ্য, বিদ্রোহী। তার নিজের রক্ত কেনিল হ'য়ে

সূর্য্যমুখী

উঠলো তার বিরুদ্ধে। এই আত্মদ্রোহে ছিন্ন, বিধগ্নিত, সে মুখ
খুবড়ে পড়লো হতাশার চোরাবাণিতে, স্পন্দমান, অসহায়,
শক্তিহীন। নিজেকে সে ঘৃণা করতে লাগলো—ওঃ, নিজের প্রতি
ঘৃণায় সে পাগল হ'য়ে গেলো। আর সেই ঘৃণার বিসৃঙ্খল নির্ঘাস
তাকে ঢেলে দিতে হবে ঘৃণালের উপর—বিষের মত, সূক্ষ্ম মৃত্যুর
মত—তা না হ'লে সে বাঁচবে না।

বুদ্ধ চললো। কিন্তু একপক্ষের বুদ্ধ ; একপক্ষের আক্রমণ ও পরাজয়।
অন্ত পক্ষ—তার কথা কিছু বলবার নেই। মৃণাল কি জানতো
তার স্বামীর মন ? সে কি বুঝতো মিহির তাকে অপমান করছে ?
‘অপমানে, প্রতিহিংসার তাকে ছারখার করে’ দিচ্ছে ? এটা কি
সে ভাবতে পারতো যে বিভিন্ন—এমন কি সম্পূর্ণ বিরোধী ভাব
বাইরে ফলে’ ওঠে একই রূপ নিয়ে। নিবিড় শরীরকে ভেদ করে’
সে কি কখনো ভিতরে উঁকি দিতে পারতো ?

কেমন করে’ পারবে ? তার শুষ্ক শরীর ছিলো, সে এসেছিলো
শুষ্ক তার শরীর নিয়ে। তার শরীরের সংস্পর্শ আর অনুভূতি—
তা-ই তার কাছে চরম। তার জগতে এর বাইরে কোনো
অভিজ্ঞতা নেই। কেবল শারীরিক প্রতিক্রিয়া দিয়েই সে একটা
জিনিস বুঝতে পারে। শরীর যেখানে অলে’ ওঠে, বন্ধ হ’য়ে ওঠে,
সেখানে সে আর-কোনো প্রশ্ন করে না। শরীর দিয়ে সে যেটুকু
পায়, যা-কিছু পায়, তা-ই তার কাছে ঐশ্বর্য্য, সব তার কাছে
একমূল্য। শরীরের সীমায় সে আবদ্ধ, শরীর ছাড়িয়ে সে যেতে
পারে না।

না, মৃণাল কিছু দেখতে পেলো না। শুষ্ক, তার অর্ধ-চেতন
পশু-সত্তায় সে সুখে আব্লুত হ’য়ে গেলো। চেউয়ের মত সে
ভেঙে পড়লো, চেউয়ের মত সে লুটিয়ে পড়লো। কুটে উঠলো তার

সূর্য্যমুখী

অন্ধকার সূর্য্য, রক্তের ঘোতে ছড়িয়ে পড়লো সূর্য্যের ঐশ্বর্য্য। সে নতুন হ'য়ে উঠলো; অন্ধকারের বীণ্ডিতে সে উদ্ভাসিত, রূপান্তরিত। সে সূর্য্যে তরে' উঠলো—তার অর্ধ-চেতন পশু-সূর্য্যে। নিম্নের ভিতরে তার এক আশ্চর্য্য উন্নীলন—সৌন্দর্য্যো, উদ্ভাপে, আনন্দে। স্রীলোক এত স্নন্দর হ'য়ে ওঠে কেবল এক কারণে।—কী তার নাম দেবো? ভালোবাসা? কিন্তু মিহিরের ভালোবাসা তো তা নয়। তবু তা-ই তাকে বলতে হয়। কেননা কথা একটাই আছে, যদিও তাব অনেক। ভালোবাসা বলতে এক-একজন এক-একরকম বোঝে: কিন্তু প্রত্যেকেই ব্যবহার করে সেই এক কথা। পৃথিবীতে সৈন্তের ভালোবাসা আছে, আর ধনী বণিকের, ক্রান্ত নাগরিকের আর কর্ত্তনাবিলাসীর, ভীকু কুমারীর, অভিজাত গণিকার, কবির, তরুণ ছাত্রের—সহজেই এ-ভালিকা দীর্ঘ করা যায়। প্রত্যেকেই ভালোবাসে, ভালোবাসা চায়: কিন্তু অভিজাতের সমষ্টি হিসেবে একটা আর-একটার অনেক দূরে; বত দূরে শেলির কবিতা পড়া আর দূরে খেলার জেতা; বত দূরে অজানা, বিশাল লব্ধে নৌকো নিয়ে ভেসে পড়া আর মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ঘরের ঘরজা-জানলা বন্ধ করে' মাসিকপত্রের পাতা ওলটতে-ওলটতে ঘুমিয়ে পড়া। বিভিন্ন, বিপরীত, পরস্পর-বিরোধী নানা জিনিষের সমস্ত আশাদের একই নাম। সেইজন্য এত কষ্ট হয় আমার কথা আর-একজনকে বোঝাতে। ভালোবাসা লব্ধে

সূর্য্যবুধী

আমাদের প্রত্যেকের মনেই একটা বিশেষ নক্সা আছে : সেখানে
যার সঙ্গে মেলে না, তার কাছে আমরা বরফ। মিহিরের
যে-নক্সা, মৃণালের তা নয়। মৃণালের নিজের নক্সার সঙ্গে বেটা
মিলেছে, সেটাতে সে সুখী। মিহির তা বুঝতে পারে না ; কি
বুঝতে পারলেও মর্ধ্যমূলে আহত হবে।

কিন্তু মিহির বোঝে কি না-বোঝে, মৃণালের তাতে কিছু এসে
যায় না। সে নিজেই বোঝে না। সে জানে না তার নিজের
উন্নয়ন। শুধু তার রক্তের মধ্যে একটা উজ্জীবন ; সমস্ত
শরীরে বসন্তের নত নতুন হ'রে ওঠা—আর-কিছু নয়। তাববার
জন্ত বহুর্ভূতকাল সে থমকে দাঁড়াতো না। একবার আরনার সামনে
অকারণে এসে দাঁড়াতো না—কী স্বপ্নের সে হ'রে উঠেছে, তা
দেখতে। শুধু সে নিজেকে ছেড়ে দিলে অন্ধকার, উক সেই
স্বাভিক্রম শোভে। শুধু সে ভরে' উঠলো অন্ধকার, অলস্ত সূর্য্যে।

কিন্তু হৈমন্তী লক্ষ্য করলেন। তাঁর চোখে ধরা পড়লো
মৃণালের উন্নয়ন। এ-সব জিনিস স্ত্রীলোকের দৃষ্টি কখনো এড়াতে
পারে না। কোনো নবীন স্ত্রীর হৃৎকের দিকে তাকিয়েই তারা
বলে' দিতে পারে—বুঝতে পারে। মৃণালের দিকে তাকিয়ে
হৈমন্তী শক্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন। আর তার নেই।

অজান মাস পড়লো । বাতালে শীতের আমেজ । আকাশ নীল ।
আগন্তে আর উজ্জ্বল মধুর-হ'য়ে-ওঠা সকালবেলা । কলকাতার
এরই মধ্যে ক্রিসমাসের উৎসব-গুহনের প্রথম সূচনা । কাজ
না-করবার সময়, অলস ভাবনার সময়, নিজের মনের মধ্যে
অকারণে খুলি হ'য়ে ওঠবার সময় ।

এই সময়ে মিহিরের সঙ্গে তাপসী দেবীর আলাপ হ'লো ।
পল্লব বলে' এক ছেলেদের কাগজে মিহির মাঝে-মাঝে
লিখতো, তাপসী দেবী তার সম্পাদক । তাঁর লেখা পেয়ে
সম্পাদক খুলি হ'তেন, সে খুলি হ'তো পল্লবে লিখে । কেননা
পল্লবের ছিলো বিশেষ একটা স্বর, একটু যেন স্বপ্নময়—
পলাতক ছায়ার মত, মেরে-মনের সুন্দর-সঙ্করী স্বর । পল্লব পড়তে
মিহিরের ভালো লাগতো । অবিদিত ছেলেদের যে-কোনো কাগজই
লে পেলেই পড়তো—কেননা এ-বিষয়ে তার সন্দেহ ছিলো না যে
বাঙলাদেশে তথাকথিত বঙ্গ লোকদের ভিত্তি যে-সব কাগজ
বেরোয় তার একটাও পড়বার মত নয় । অন্তত বঙ্গ লোকের
পড়বার মত নয় ।

তাপসী দেবী নিজেও কবিতা লিখতেন—ছোট-ছোট ছবি,
একটু কাপসা, যেন পাখা কুরাশার ভিতর দিয়ে দেখা । অলস
তার ছন্দ, নরম তার রঙ । মোমের আলোর মত নরম, চোখের

সূর্যমুখী

উপর জড়িয়ে-আগা ঘুমের মত। খানিকটা ক্রিস্টিনা রশেটির মত—যখন তাঁর মন ভালো থাকতো না। মিহিরের সে-সব কবিতা ভালো লাগতো। আর সে-ভালো-লাগা অবিভক্তি পারস্পরিক। (এটা কেন হয় যে ছ’জনের যখন পরস্পরের লেখা ভালো লাগে এবং সে-কথা তারা প্রকাশ করে, লোকে তাদের ঠাট্টা করে’ বলে—মিউচুয়ল অ্যাডমিরেশন সোসাইটি? তাতে ঠাট্টা করবার কী আছে? তা হ’লেই তো সব চেয়ে ভালো। অ্যাডমিরেশন যদি মিউচুয়ল না হয়, সেটাই তো ভয়ঙ্কর মারাত্মক।) পারস্পরিক—এবং উচ্চারিত। মাঝে-মাঝে তারা পত্রবিনিময় করতো—পল্লব উপলব্ধ্য করে’। তাপসী দেবীর হাতের লেখা ছোট-ছোট, লতানো; এক-একটা লাইন এক-একটা ক্লশ, কালো সাপের মত। কোনো চিঠিতে তিনি হয়-তো লিখতেন : ‘একদিন আনুন না আমাদের এদিকে—যদি সময় করতে পারেন।’ মিহির লিখতো উত্তরে : ‘চেষ্টা করবো।’ কিন্তু বাওয়া তার কখনো হয়নি, যেতে তার ইচ্ছাই করেনি। হয়-তো তার ভয় হয়েছে পাছে তাপসীকে তার ভালো না লাগে—পাছে বড় বেশি ভালো লেগে যায়।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত, প্রায় ছ’বছরের কাগজের আলাপের পর তাদের দেখা হ’লো। তাপসীর সম্বন্ধে মিহির কিছুই জানতো না। সেই সন্ধ্যায়, নিজকে পার্ক সার্কাসের এক ছোট, একতলা বাড়ির সামনে দেখতে পেয়ে সে হঠাৎ অবাক হ’রে গেলো। পল্লব

স্বর্গাসুখী

আপিসের এই ট্রিকানা। কিন্তু ঘোটেও আপিসের দত্ত দেখতে নয়—তা তো নয়ই। এটা তাবের থাকবার বাড়ি—সে এখানে নিমন্ত্রিত। অবিভি পল্লবের উপলক্ষ্যেই নিমন্ত্রিত। পল্লবের পাঁচবছর পূর্ণ হ'লো—সেইজন্য ছোট একটা—কী বলে ওকে?—শ্রীতি-বন্দেলন। কী কুৎসিত কথা, শোনামাত্র সমস্ত শ্রীতিরূপ তাব উবে যায়।

হয়-তো সে না এলেই ভালো করতো। ঘরে আলো জ্বলছে, শোনা যাচ্ছে কথা। হয়-তো অনেক লোক এদেছে, হয়-তো হুঁমিনিটেই সে হাঁপিয়ে উঠবে, তার ভালো লাগবে না। কী করে তার মাথার এটা ঢুকলো যে আসতে হবে? কিন্তু তাপসী এক সুন্দর করে' চিঠি লিখেছিলো। সে-ও তো পারতো তার চেয়েও সুন্দর করে' লিখে জবাব দিতে। সত্যি বলতে, এখানে তার উপস্থিতির চাইতে সেই চিঠি অনেক বেশি ভালো শোনাতো—ও দেখাতো।

কটকের গারে বেখানে বাড়ির নম্বর লেখা, সেদিকে কুঁকে সে দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় তার পিছনে একটা কঠোর শব্দে : 'হ্যাঁ, এই বাড়ি। আনুন।'

কিছু তাকিয়ে সে দেখলো, বছর আঠারোর একটি ছিপছিপে ফর্সা ছেলে। সে তার চোখের দিকে তাকাতাই ছেলোট ছেনে বললে : 'আমি আপনাকে চিনি। আনুন।'

সূর্যাস্ত

তাপসীর ভাই—নিশ্চয়ই। এই ভাই আর যাকে নিয়ে সে থাকে এই বাড়িতে। বাপ ছিলেন রানিগঞ্জে কল্যাণ-খনির ইঞ্জিনিয়ার। অল্প বয়সে তত্ত্বলোক দ্বারা দ্বার। তাপসীর তখন পনেরো বছর। তারা চলে আসে কলকাতায়—আর কোথাও যাদের থাকবার জায়গা নেই, তাদের থাকবার একমাত্র জায়গা। কিছু পরলা ছিলো : ছুঁতাবনার কোনো কারণ ছিলো না। রানিগঞ্জে কোনো সমাজ নেই : কোনো সামাজিকতার ছকের মধ্যে তার বাল্যের লালন হয়নি। শিশুকাল থেকে কলকাতার আওতার বেসব ঘেরে থাকুব, তাদের থেকে সে খানিকটা অন্তরকম হ'তে বাধ্য। যুঁকে বলে কোণগুলো ঘেঁষে সমান করে' দেয়া, তার জীবনে তা ঘটতে পারেনি। ইকুলে না-গিয়ে, গান না-শিখে, অটোগ্রাফ সংগ্রহ না-করে', সিনেমালোকের বেববেবীর পুজো না-করে' সে তার পনেরো বছর পূর্ণ করেছিলো। কোনো গণ-মনোভাব ছেলেবেলা থেকে তার মনকে 'তৈরি' করেনি। পনেরো বছরে, অনেক জায়গায় সে কাঁচা, অনেক জায়গায় সে অস্বাভাবিকরকম গভীর। তার মধ্যে অনেক কোণ, অনেক আকাঙ্ক্ষা। কিছু এলোমেলো, অগোছাল তার স্বভাব, বর্ষার হাওয়ায় মত। বর্ষার মেঘের মত তার মনের অলংকার রঙিন মুহূর্ত, পরস্পরাহীন। যেমন খুশি সে হ'য়ে উঠেছে নিজের স্বভাবেরই। গরজে, পশ্চিমের

সূর্যমুখী

মাহারাঠা-আকাশের নিচে ধূসর, চেউধেলানো প্রান্তরের মাঝখানে ।

বই সে ভালোবাসতো । কলকাতা থেকে মাসিকপত্র আসবে—
উন্মাদের মত সে তার প্রতীক্ষা করতো । তার নামেই আসতো
সব কাগজ—প্রতিটি মোড়ক তার নিজের হাতে খোলা চাই ।
প্রতিটি কাগজের বিশেষ একটা রূপ ছিলো তার মনে, নিজের
একটা গন্ধ—যা ভুল করা যায় না । সাহিত্য আর ভারতী,
সম্বন্ধপত্র আর নারায়ণের ভিতর দিয়ে সে বড় হ'য়ে উঠলো ।
ও-সব কাগজ সে বুকে পড়তো, না-বুকে পড়তো, মনে-মনে বা-
হোক একরকম ভেবে নিয়ে পড়তো—সে/ ভালোবাসতো
কথাগুলো । তারপর এলো বাঙলা মাসিক সাহিত্যের বাজারে যুগ
—বিরাট বশু আর রঙিন ছবির, চারটে করে' ধারাবাহিক উপভাস
আর দশটা করে' ছোট গল্পের, সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী আর বিভিন্ন
ভাষার বিস্তর উদ্ধৃতি-বহুল প্রবন্ধের যুগ । সে-সময়ে তাপসী
অনেকটা বুকে পড়তে শিখলো, কিন্তু তখন আর বাঙলা মাসিক
সাহিত্যে বুকে পড়বার মত বিশেষ-কিছু নেই ।

এত পড়লে লেখবার জন্ত হাত চুলকোবেই । রানিগঞ্জে
ধাকতে তাপসী সমানে বেড় বছর হাতে-লেখা এক কাগজ চালিয়ে-
ছিলো—তার নাম কাজল । তার মা নামকরণ করেছিলেন,
তার বাবা প্রথম সংখ্যার কাজল ও কমলা নামে প্রবন্ধ লিখে-

সূর্য্যসুখী

ছিলেন। একটা পারিবারিক পত্রিকা হ'লে উঠবে, এমন লক্ষণ দেখা গিয়েছিলো। সাত বছরের চারণ আকতো ছবি। কিন্তু ছ' একমাস বেতেই দেখা গেলো মা আর বাবা কাজলের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ একটি মাস্তবের হাতে ছেড়ে দিবে নিশ্চিত। এমন কি, চারণের ব্যবহার দেখেও মনে হয় না কাজলের পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করাই তার জীবনের প্রধান আনন্দ। কিন্তু কাজল চলতে লাগলো—প্রতি মাসের ঠিক পরলা তারিখে একটি করে' সংখ্যা বেরোয়—তাতে গল্প থাকে, কবিতা থাকে, ধারাবাহিক উপভাস থাকে, প্রবন্ধ থাকে, সুরেশ সমাজপতির চঙে মাসিক সাহিত্যের সমালোচনা থাকে, এমন কি, বিজ্ঞাপন থাকে। (তাপসীর জীবনের প্রথম মোহ-ভঙ্গ হয়, যখন সে জেনেছিলো যে বিজ্ঞাপনগুলো কাগজওয়ালারা কাগজের নোঁটবের জন্ত নিজেরা ভালো করে' লিখে ছেপে দেন না, বরং তা ছাপাবার জন্ত ইকি ঘেপে পরলা আদায় করেন।) সে-সমস্ত লেখা তাপসীর নিজের; একঘেরেমি এড়াবার জন্ত তাকে আটটা ছয়নাম উদ্ভাবন করতে হয়েছিলো। মাকে-মাকে যখন তার কোনো বন্ধুর কোনো লেখা বেরতো, সেই বন্ধুর মা-বাবা তা বিশ্বাস করতে চাইতেন না : বলতেন, 'তাপসীই তোমার নামে লিখে দিয়েছে।' পাড়ার মধ্যে কয়েকটি বাড়ির মধ্যে কাগজের প্রচার। কোনো মহিলা তাদের বাড়ি বেড়াতে এসে তাপসীকে হয়-তো জিজ্ঞেস করতেন :

সূর্যমুখী

‘কী গো, তোমার আবার লংঘ্যার কল্প?’

আর তাপলী উত্তর দিতো :

‘এই তো, মাসিক সাহিত্যটা শুধু বাকি, পড়লো তারিখেই
বেসিয়ে যাবে।’

কি, তার বাবার কোনো বন্ধু তার কাছে এসে মুখ কাঁচুকাচু
করে’ বলতেন :

‘আবার একটা লেখা আছে—তোমার কাগজে কি চলবে?’

আর সে, গম্ভীরভাবে :

‘হ্যাঁ যান। টিকিট দেয়া থাকলে ফেরৎ বেঁধা হবে।’

তীব্র মজা—অনেক নাম বিরে অনেক ভিন্নিগ লেখা। এমন
উত্তেজনা আর কোন্ খেলার? আর কোন্ খেলার এমন
সার্বজনীন ভাবে থাকা যায়? চারদিক থেকে অজস্র প্রশ্নের পেয়ে-
পেয়ে তার মনে অলংঘ্য কুঁড়ি ধরতে লাগলো। তার শিক্ষা
হ’লে পড়লো একটু একপেশে, তার সহানুভূতি একমুখো। তার
প্রকৃতিতে একটুখানি সহজ বস্তুতাব ধেন লেগেই রইলো।

এমনি, সে উঠতে লাগলো বড় হ’লে। কাজল বন্ধ হ’লে গেলো,
তার লেখা বন্ধ হ’লো না। সে ভালোবাসতো কথা, শিশু বেমন
রক্ত ভালোবাসে। কথার রক্ত লাগলো তার মনে : তার ভালো
লাগতো রঙিন কথাগুলোকে পর-পর সাজাতে, বিশেষ একটা
ছন্দে, ছবির মত করে’। তার যে আগ-কোনো মানে আছে,

সূচীসূচী

তখন পর্য্যন্ত তার তা মনে হ'তো না। তার ভালো লাগে, তার সুখ লাগে—এই হচ্ছে প্রথম এক শেষ কথা।

তারপর কলকাতা। সে করেকটা পদ্ম ছাপালে বাসিকপত্রে। লোকজনের সঙ্গে চেনা হ'তে আরম্ভ করলো। একটু-একটু পরিচয় হ'লো সহরের সাহিত্য-সমাজে—অন্তত তার একটা অংশে— কারণ সে-সমাজ যে কোন্টা আর কোন্টা নয়, তার মধ্যে কে যে আছে আর কে নেই, তা ঠিক করে' বলা শক্ত। তার লেখা অনেক কমে' এলো; বেশির ভাগ সময় কাটতে লাগলো গল্প করে' আর বই পড়ে'। তারপর, তার বয়েস যখন আঠারো সে হঠাৎ বা'র করে' বসলো এক কাগজ—এই পল্লব। ছেলেদের, কেননা হঠাৎ সে আবিষ্কার করেছিলো যে ছেলেদের জন্ত লিখে সে বত সুখ পায়, অমন আর কিছুতে নয়। যেমন করে' সে যেন নিজেকে পেয়ে গেলো। নিজেকে যেন চিনলো শিশুর জগতের অন্দারে অর্দ্ধালোকে। সেখানে অক্লান্ত খেয়াল, কল্পনার উদ্ভাসবত বুদ্ধি, সেখানে অসম্ভবতর স্বপ্ন। তারই টুকরো-টুকরো ছবি সে আঁকতো—যখন খেয়াল হ'তো। বাক্যে ব্যাতি বলে তা তার হ'লো না; কিন্তু নিজের মধ্যে একরকমের পরিপূর্ণতা সে পেলে।

সে-সব লেখা পড়ে' মিহির তাকে কল্পনা করেছিলো খ্রিস্টিনা রসেলির মত দেখতে। লেটা কিছু আশ্চর্য নয়; কিন্তু

সূর্যমুখী

সব চেয়ে বা আশ্চর্য্য তা এই যে সত্যি-সত্যি তাপসীকে সে সেইরকম দেখতে পেলো, অনেকটা ক্রিস্টিনা রসেটির মত। ঠিক এমনিই সে তাপসী দেবীকে মনে-মনে ভেবেছিলো। রজনীগন্ধার কুন্তের মত শরীর। টানা চোখ, গায়ের রঙে স্নান আভা, স্নান, প্রি-র‍্যাফেলাইট চুল। চোখের দৃষ্টি একটু বেন ক্লাস-জীবৎ বেরিয়ে-আসা গালের হাড়ে থেকে-থেকে গোলাপি আভা ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায়। তার পরনে ধবধবে সাধা সিন্ধ, ইলেকট্রিক আলোর নিচে আলোর বুনো-নোর মত। মিহির বিষয়ে স্কন্ধ হ'য়ে গেলো। তার বেন মনে হ'তে লাগলো এই মেরেকে অনেক আগে থেকে সে চিনে আসছে; কবে যে তাকে প্রথম দেখেছিলো ঠিক মনে করতে পারছে না।

প্রথম পরিচয়ের পর তারা সাধারণ সভার মিশে গেলো। ছোট একটি সাহিত্যিক হল—হু'একজনের সঙ্গে মিহিরের আগেই আলাপ ছিলো। তারা সবাই সেই সুখী সম্প্রদায়ের বাবের পরলা আছে, প্রচুর অবসর আছে; বই পড়ে', বই নিয়ে আলোচনা করে' আর মাঝে-মাঝে হু'চার পাতা লিখে বাবের সময় কাটে। হু'জন এসেছিলেন স্ত্রী নিয়ে; মাঝে-মাঝে তাঁরা জৈবানিকের সংকিশ্লপ্ত পুস্তক-পরিচয় লেখেন। লঘু, হাসিখুসি আলাপের স্রোত, মাঝে-মাঝে মোড় নেয়, কখনো কিরে আসে, কখনো কোথাখুনি গড়িয়ে চলে—সকলেরই জন্তে, সকলের মধ্যে

সূর্য্যযুধী

সমান বিতরিত। ঘরের মধ্যে একটা উচ্চতার অহুভব। নিজেরই অজ্ঞাতে মিহিরকে টেনে নিলে সেই উচ্চ আবহ। সে কথা কইলো, সে হাসলো, অলঙ্কিতে সে খুসি হ'য়ে উঠলো। আর সমস্ত-কিছুর আড়ালে, সমস্ত-কিছু সংযুক্ত করে, সম্পূর্ণ করে তাপসীর শুভ্র উপস্থিতির অস্পষ্ট ঝিলিমিলি। সমস্ত কথার আর হাসির সে হচ্ছে নেপথ্য-স্বর। সাধারণ আলাপের মধ্যে মিহির সোজাশুজি তার সঙ্গে বেশি কথা কইতে পারলে না—কিন্তু ঘরের মধ্যে এই উচ্চ সঞ্চার যেন তার শরীর থেকেই নিঃসৃত, তাকে সে ভুলে গাকতে পারলে না, সব সময় সে তাকে অহুভব করেছে—কোনো সূদূর, অবচেতনভাবে। আর মিহিরের যেন মনে হ'লো তাপসী তাকে টানছে—অদ্ভুত, মধুর আকর্ষণ। সে বাধা দিলে না, রোধ করলে না ; সে তা উপভোগ করলে—সেই মধুর ঐশ্বর্য্যময় আকর্ষণ। তা ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ছে তার দ্বায়মণ্ডলীতে হৃদয় উচ্ছলিতে। তা অস্পষ্ট-মধুর—অনেকক্ষণ বদ্ধ ঘরে থাকবার পর রাস্তার বেরুলে হঠাৎ পারে-এনে-লাগা রাজির হাওয়ার মত।

সাদা, কোণওয়াল পেরালার চা পরিবেষিত হ'লো। চা খেতে-খেতে একজন বললে :

‘আমি ভাবছি একটা চরনিকা বার করবো—মালিকপত্রে প্রত্যাখ্যাত কবিতার চরনিকা। সঙ্গে-সঙ্গে সম্পাদকের মন্তব্য থাকবে।’

সুখানুশী

‘চবৎকারি ।’ মহিলাদের একজন বললেন, ‘কবিতা বা-ই হোক, বক্তব্যগুলোর জন্তই বইখানা পড়বার মত হবে ।’

‘কবিতাও কিছু খারাপ হবে না । প্রথমেই থাকবে সীতাকলি থেকে কয়েকটা গান । পরা বাক্ “শ্রাবণ ঘন গহন ঘোছে” । অধ্যাতনামা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এটি পাঠিয়েছেন কোনো বিখ্যাত সম্পাদকের কাছে । সম্পাদক কী বলে’ তা কেয়ং দেবেন বলতে পারেন ?’

সম্পাদক সেন, বার প্রথম উপজ্ঞান অন্নদিন হ’লো বেরিয়েছে, উত্তর দিলে :

‘সহজেই বলা যায় । তরতর বিবেকওয়াল সম্পাদক, প্রত্যেকটি লেখা নিজে পড়েন, নিজের হাতে চিঠি লেখেন । নিজের মতামতের উপর অসীম শ্রদ্ধা । তাঁর মন্তব্য অনেকটা এই গোছের হবে : “কবিতা ছই প্রকার—ভালো ও মন্দ । আপনার কবিতা ভালো নয়, সুতরাং তা মন্দ । মন্দ কবিতা লিখিতে কোনো বাধা নাই, কিন্তু তার প্রকাশ নিষিদ্ধোক্তন ।” এতে হবে, নৃপেশ ?’

নৃপেশ—প্রথমে যে কথাটা তুলেছিলো—যুচকি হেনে বললে : ‘মন্দ নয়, কিন্তু এর চেয়েও ভালো হ’তে পারে ।’

‘কি বধি ঠাট্টার দিকে বাও, সমাজপতি আর প্রভাত সুখ্যোর বিশেষ চড়ে, তা হ’লে এ-রকম হ’তে পারে : “আপনার বন্ধ ও প্রিয়তম কেন যে আপনাকে হেলার ঠেলিয়া চলিয়া গেলো, এই

সূর্যমুখী

কবিতা পড়িয়াই তা বোঝা যায়। আপনারই মঙ্গলের জন্য এ-লেখা আমরা ছাপিলাম না; কেন সামান্য একটা লেখার বোহে সমস্ত বন্ধুদের বিসর্জন দিবেন ?’

‘না, এটা বড় বাড়াবাড়ি হ’য়ে যায়।’

‘সম্পাদকদের কথাই যখন উঠলো,’ সুভদ্রা সরকার বললেন, ‘একটা সত্যি গল্প শুনুন। একটি ছেলে কতগুলো কবিতা নিয়ে যায় চিত্রাঙ্গদা অপিসে। প্রথমে সে আমার বাঁ পকেট থেকে একতড়া তর্জমা বার করলে। সম্পাদক সেগুলোর দিকে একবার তাকিয়েই বললেন : “তর্জমা আমরা ছাপিনে।” “এমনি লেখাও আছে,” বলে’ ছেলেটি ডান পকেট থেকে অস্ত্র-এক তাক্কা বার করে’ টেবিলের উপর রাখলে। “এত বড় কবিতা চলবে না,” কাগজের তাক্কাটা হাতে নিয়েই সম্পাদক বললেন। “ছোট কবিতাও আছে। পিছনে দেখুন।” সম্পাদক পিছনে দেখলেন, গভীর হ’য়ে গেলেন। ছ’ পাতাব্যাপী প্রেমের কবিতা থেকে হু’লাইনের এপিগ্রাম পর্যন্ত সমস্ত রকম জিনিস জুড়ে আছে।’

‘তা সম্পাদকেরই বা এমন জেব কেন? মালিকপত্রে যে-কোনো পড়ই তো ছাপা যায়—এব্য ছাপা হয়।’

‘শুনুন না। তখন সম্পাদক একবার তর্জমাগুলোর দিকে, একবার অস্ত্র পত্ৰগুলোর দিকে তাকাত্তে লাগলেন—আর যেমে উঠতে লাগলেন। ছেলেটি চুপ করে’ বলে’ মজা দেখতে লাগলো।

সূর্যমুখী

খানিক পরে সম্পাদক হঠাৎ বলে উঠলেন : “হয়েছে। আপনার এই লেখাটিই আমরা রাখতে পারি।” বলে, মূল রচনার মধ্যে সবার উপরে যে-সময় পড় ছিলো, সেটি দেখালেন।

‘“অত বড় কবিতা চলবে?”

‘“তা কোনোরকমে ঠেসে দিতে পারবো। লেখা ভালো হ’লেই
‘লো—এই আমার প্রিন্সিপল।”

‘“আচ্ছা, ধন্যবাদ—”

‘“পরের মাসের চিত্রাঙ্গদার কবিতাটি বেরলো। কবিতার উপরে ত্র্যাকেটের মধ্যে লেখা, “রূপার্ট ক্রক হইতে”। ছেলেটি মাথার হাত দিয়ে বসলো। হাঁপাতে-হাঁপাতে গেলো সম্পাদকের কাছে।

‘“এ কী হয়েছে?”

‘“কী হয়েছে?”

‘“এই যে রূপার্ট ক্রক?”

‘“ও, ওটা আমিই বসিয়ে দিয়েছি। আপনার তো নাম নেই, আপনার লেখা এত বড় কবিতা ছাপলে ভালো দেখার না। আপনারও এতে ভালোই হবে—আপনার কবিতা কে পড়তো, বলুন—রূপার্ট ক্রকের নাম দেখে তবু যদি একটু পড়ে। আপনি কিছু ভাববেন না—কেউ তো আর মিলিয়ে দেখতে বাবে না।”

সবাই হেসে উঠলো। একজন বললে, “সম্পাদকের সম্বন্ধে সব গল্প সংগ্রহ করে’ একটা বই করলেও হয়।”

স্বৰ্ণযুগী

সম্পাদকদের নিয়ে আলোচনা চললো। সবারই হ'একটা গল্প জানা আছে বলবার মত। এই হচ্ছে সাহিত্যের অলিগলি—নিরুদ্দেশ ঘুরে বেড়াবার এমন জায়গা আর নাই। জীবনের সমস্ত কমেডি সেখানে ছড়ানো। সুকুমার রায়ের, জগীশের মত তা বিকৃত, অতিরঞ্জিত, আত্মপরিচয়, হাস্যকর, অসম্ভব।

রাত বাড়লো। কেউ একজন উল্লেখ করলে ঠাট্টাবার কথা। তাপসী বললে, 'বোলো, এখনই কী?' সবাই যেন একটু নড়ে-চড়ে ভালো হ'রে বললো। আলাপ চলতে লাগলো ক্লীর্ণস্রোতে, থেমে-থেমে। হঠাৎ শশাঙ্ক লেন, মিহিরের দিকে তাকিয়ে : 'মিহির, তোমার জীকে নিয়ে এলেই পারতে ?'

মুহূর্তে মিহির গলা পর্যন্ত আরক্ত হ'রে উঠলো। এবং সে অসম্ভব করলে যে সবাই তা লক্ষ্য করেছে। সে কোন্‌দিকে তাকাবে বুঝতে পারলে না।

তাপসী তাকে বাঁচিয়ে দিলে :

'আমারই দোষ। আমি জানতুম না ...'

শশাঙ্ক বললে : 'অনেকেই জানে না। মিহিরের জীকে কেউ কখনো দ্যাখেনি।'

মিহির চেষ্টা করে বললে : 'তাকে এখানে আসতে বললেও সে আসতে চাইতো না'

সূর্য্যাস্ত

‘কেল, তিনি কি তোমাকে দ্বিধে আনাঘের সবাইকে বিচার
করছেন নাকি ?’

সবাই হাসলো, মিহির সব চেয়ে বেশি। হাসতে পেরে সে
বাঁচলো। এই সুযোগে তাপসী প্রশ্ন-পরিবর্তন করলে :

‘আপনি অনেকদিন কিছু লিখছেন না, মিহিরবাবু।’

সুভদ্রা সরকার বলে উঠলেন, ‘কেবল একজনের জন্তেই
লিখছেন ?’

‘সব সময়ই তো আমি একজনের জন্তেই লিখি।’

সুভদ্রার চোখে কৌতূহলের ছটা।—‘সব সময় ?’

‘সব সময়। একজনের জন্তেই আমার সব লেখা। সে আমি
নিজে।’

সুভদ্রার মুখে একটু নিরাশার ছায়া পড়লো। আর তাপসী
অজ্ঞেয় করলে, ষা দিকে চওড়া সিঁখি-করা তার মাথা ঝুঁক
মিহিরের দিকে বাড়িয়ে দ্বিধে :

‘তা হ’লে অস্ত্র লোকের জন্ত আপনি ছোটোও ভাবেন না ?
তারা পড়লো কি না পড়লো, তাদের ভালো লাগলো কি লাগলো
না ?’

‘অতটা বলতে পারিনে। —অস্ত্রকে পড়াতে তো চাই-ই; কে
না চায় ?’

‘তবে ?’

সূর্য্যদূষী

‘সেই তো হুঙ্কিল। আর সেই তো হুংখ। আমার মনে আছে একটা কথা, তা আমি বলতে চাই। অন্তরের বোঝাতে চাই। কিন্তু আমার কাছে সে-কথার যা মানে, তা শুধু আমারই কাছে। অস্তর্য্য তা বোঝে না, বুঝতে পারে না। প্রত্যেকের মনের আলাপ-ইচ্ছা, তারই সঙ্গে আমার লেখা তারা মানিয়ে-মানিয়ে নেয়। তারা যা পড়ে, তা আমার লেখা নয়; আমার লেখাকে তারা যে-ভাবে পেতে চায়, পেতে পারে—মানে, আমার কবিতার তাদের নিজস্ব পাঠ। অনেক রকম মানুষ, তাই সে-পাঠ অনেক রকম হ’তে বাধ্য। তার মধ্যে কোথায় হারিয়ে যাব—ঠিক আমি যে-কথা বলতে চেয়েছিলুম। আমার কবিতার আমি যা পড়ি, অস্ত-কেউ তা পড়ে না, পড়তে পারে না। কেবল আমারই মস্ত আমার লেখা।’

‘চিরন্তন আদর্শ! এ-কথা মনে নিলে তো লেখাই ছেড়ে দিতে হয়।’

‘মাঝে-মাঝে আমার তো ইচ্ছাই করে ছেড়ে দিতে। মানুষ এত আন্তে-আন্তে বাড়ে আর আত্ম এত কম আর মানুষের জাতি এত দুর্ব্বল যে লেখবার কোনো মানে হয় না।’

‘মিহির আর তাপসী হল থেকে একটু পাশে গিয়ে’ এসেছিলো; তাদের কথা আর-কেউ শুনছিলো না। ছোট-ছোট দলে ভেঙে গিয়ে বিক্ষিপ্ত, মুহু আলাপ—কোনো মতামতের দিকে যেমন হয়।

মৃত্যুদুখী

এরা হৃৎকন হঠাৎ নিজেদের দেখতে গেলো মৃত্যুদুখী, কথার আবদ্ধ।

‘আপনার কথা হয়-তো বুঝতে পারছি। যে-সব আশ্চর্য্য কবিতা জীবনে কখনো লেখা হবে না, তার কথা ভেবে কোন্ কবির না মন-খারাপ হয়েছে? হঠাৎ মনের মধ্যে সুর এসে জগে—
রঙিন, পলাতক একটা মূর্ত্ত—সব সময় তাকে কথার ধরে’ রাখা যায় না। অনেক সময় তাকে ধরে’ রাখতে গিয়ে দেখা যায়, এরই মধ্যে রঙ এলেছে ফিকে হ’রে। কত যে কথা আমরা ভাবি—
যদি বা সব ধরে’ রাখা সম্ভব হ’তো, সময় নেই। সময় নেই; দিনগুলো বড় ছোট, জীবনে নানারকম জিনিসের ভিড়। পৃথিবীর সব চেয়ে বড় কবিকেও বা হারাতে হয়, সে-ভুলনার তিনি বা দিয়ে বান তা অত্যন্ত তুচ্ছ। আর মানুষের পরিণতি এত মহন, কোনো অমুভূতি আসতে-আসতেই হয়-তো জীবনের অর্ধেক কেটে গেলো। যে-বয়েসে আমরা ভাবতে শিখি, যে-বয়েসে জীবনের ঘটনাগুলোকে মনের মধ্যে কিছু-একটা করে’ তোলবার ক্ষমতা আমাদের হয়, তা এত দেরিতে যে ভাবতে গেলে মন খারাপ হ’রে যায়। প্রতি বছরেই যেন আমার নতুন কোনো সজা, প্রতি বছরই মনে হয়, “এতদিন আমি কোথায় ছিলাম?” কী যেন একটা মনের মধ্যে ক্রমাগতই ভেঙে বাজে, হ’রে উঠছে। দিগন্ত কেবলই বাজে দূরে সরে’। নিজেকে দেখে-দেখে অবাক লাগে, হতাশ হ’তে হয়।

যেটুকু আমার প্রকাশের ক্ষমতা, তাকে আমি কেবলই ছাড়িয়ে যাবো। মনে হয়, নিজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে কখনো পারবো না। মনের মধ্যে যে-সব স্বপ্ন ছাড়া কণিক রেখা এঁকে যাচ্ছে, কোথায় পাবো তার ভাষা? তখনই মনে হয়, কী হবে বলে? ভাষা তো একটা রাধা : তা নষ্ট করে, বিকৃত করে, তার ভিতর দিয়ে ভাবনা ছড়িয়ে বায়, বায় হারিয়ে। ভাষার সীমা আছে, ভাবনার নেই। ভাবনার কোনো বাধা নেই : তা সর্বব্যাপী ও চিরন্তন। তা সহজ, বিগত, সীমাহীন। তার উপর, তাতে শারীরিক কোনো চেষ্টার স্বরকার করে না। ভাবতে এত ভালো লাগে যে—যে বনে-বনে কেবল ভাবতেই ইচ্ছে করে। মনের ভিতরটা এমন নিবিড়, এমন সোনালি হ'রে ওঠে যে তখন আর কলম ছুঁতে ইচ্ছে করে না। তখনই লেখা ব্যাপরেটাকে মনে হয় অসহনীয় স্থল। মনে হ'তেই পারে। কিন্তু তাই বলে, হঠাৎ একটু থেমে তাপসী কথাটাকে ব্যক্তিগত স্তরে নামিয়ে আনলো, 'একেবারে না-লেখবার কোনো মানে হয় না', 'সে হেসে বললে। অনেকদিন কোনো কাগজে আপনার কোনো লেখা দেখিনি।'

'কাগজে দিইনে অনেকদিন।'

'লিখেছেন, তা হ'লে?'

মিহির একটু হাসলো।—'মাসিকপত্রে কবিতা ছাপবার কথা ভাবতে মাঝে-মাঝে আমার অসহ্য বিরুদ্ধা হয়। আমি বা লিখেছি

সূর্য্যবুধী

তার উপর কেউ ট্রামে যেতে-যেতে অলসভাবে একটু চোখ বুলিয়ে গেলো—এ আমি সহিতে পারিনে। কি, কোনো ডিপুটি-গিম্মির দিবা-নিদ্রার সহায়তা করতে—’

তাপসীর মৃদুস্বর তাকে বাধা দিলে। ‘কিন্তু সবাই ও-রকম ‘নর’, সে বললে।

‘প্রায় সবাই।’

‘কিন্তু সবাই নয়। অল্প বে ছ’চারজন, তাদের নিরেই তো কথা। আর্ট জিনিটাই সম্পূর্ণরূপে সাম্প্রদায়িক।’

‘এ-কথা ভাবতে খুবই আরাম লাগে—বতকণ ধরে’ নেয়া যায় যে আপনি আর আমি বীক্ষিতের দলে।’

‘তাঁ কি নই?’

বাঁকা ভুরু নিচে তাপসীর টানা চোখের দিকে তাকিয়ে মিহির চূপ করে’ রইলো। ‘সব সময়েই ছ’চারজন থাকে, তাপসী বলতে লাগলো, ‘এ-ই তো সাক্ষ্য। কোনোখানে, কেউ হয়-তো আপনার মত করে’ ভাবছে। আপনার কথা যেই তার বনকে ছুঁয়ে গেলো, ভেগে উঠলো প্রতিধ্বনি—বেন সে-কথা তারই মধ্যে এতদিন ছিলো চাপা হ’য়ে। হয়-তো সেই ছ’চারজনের জীবনে আপনি কয়েকটি সোনালি মুহূর্ত এনে দিলেন—সেটাই কি কম? সেখানেই সার্থক হ’লো আপনার লেখা। তারপর—তা না-ই বা থাকলো, না-ই বা মনে রাখলে লোকে। এমন

সূর্যাস্ত

‘ঐশ্বর্য পেয়ে ও দিতে পেরেও যে আরো বেশির লোভ করে,
তাকে কী বলবো?’

তাপসীর কথা বলার ধরণে প্রবল আগ্রহ, আনন্দের ছন্দ।
নদীর মত তা তার ভিতর থেকে প্রবাহিত। ছোট-ছোট ডেউ
ফুলে যাচ্ছে চারদিকে। মিহির সেই উদ্দীপিত উচ্চ কণ্ঠস্বর
শুনতে লাগলো, মুগ্ধ। এক-এক সময় তাপসী একটু তাড়াতাড়ি
কথা বলে, একটু উচ্চস্বরে, নিজেরই তা টের পায় না। আর সে
যখন হাসে, হঠাৎ তার সমস্ত মুখ যেন আলোর জলে গুঁথে।

মিহির আর-কিছু বললে না। কিছু বলবার ছিলো না বলে,
নর, অনেক-কিছু বলবার ছিলো বলে। অদ্বৈতরকম চঞ্চল হ’য়ে
উঠছিলো তার মন। তার ইচ্ছে করছিলো কথা বলতে, চূপ করে
ধাকতে, তাপসীর শুভ্র লাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকতে।

একজন উঠে দাঁড়ালো। ভাঙলো সভা। সবাই উঠছে,
সবাই একসঙ্গে কথা বলছে। মিহিরকেও উঠতে হ’লো। পুরো
দলটি একসঙ্গে বেড়ালো, বারান্দা পার হ’য়ে রাস্তায়। কে বেন কী
একটা-কিছু বললে, একটা হাসির ঢেউ খেলে গেলো। গর্জ্জে
উঠলো একটা মোটরের এঞ্জিন।

—‘তাপসী, ভুলো না কিছু।’

—‘নৃপেশ আমাদের গাড়িতে এসো না।’

—‘চলো হাঁটি। চমৎকার রাত।’

স্বপ্নমুখী

—‘কারো কাছে একটা সিগ্রেট আছে ?’

—‘...পড়ে’ বেথো। সত্যিকারের ভালো লেখা।’

—‘আঃ, আমার ঘুম পেরে আসছে।’

কণ্ঠস্বরগুলো দূরে সরতে লাগলো, কীণ হ’য়ে এলো, মিলিয়ে গেলো। আর হঠাৎ মিহির নিজেকে দেখতে পেলো, রাত্রির রাস্তার দাঁড়িয়ে, তাপসীর সুখোমুখি। তাপসী কীণ একটা ভঙ্গি করলে। সবাই চলে’ গেছে, অথচ সে এখনো দাঁড়িয়ে কেন ? মিহির ভেবে অবাক হ’লো। সে কি কিছুর অস্ত্র অপেক্ষা করছিলো ? সে কি আরো কোনো কথা শুনতে চায় ? তার বেন মনে হচ্ছে তাপসীর সঙ্গে অনেক কথাই তার বাকি রয়ে’ গেলো। হৃৎকেন্দ্রের মধ্যে একটা সংস্পর্শের স্তম্ভপাত বে-মুহূর্তে হ’লো, অমনি তা’ গেলো ছিন্ন হ’য়ে।

তাপসীকে সে বলতে শুনলো : ‘আপনার দেরি হ’য়ে গেলো না তো ?’

আর সঙ্গে-সঙ্গে তার মনে ফিরে এলো তার বাড়ি ; অভূর্ত, অপেক্ষমান, মৃণাল ; সমস্ত রাত্রি ভরে’ মৃণালের নিঃশব্দ সঞ্চার ; রাত্রি ভরে’ মৃণালের উষ্ণ শ্রোত। আর তাপসীর অস্পষ্ট শুভ্র মুষ্টি দিকে সে তাকালো—চাঁদের মত স্নান, রাস্তার আবছারায় এক টুকরো চাঁদের মত তার ঝিলিঝিলি। আর হঠাৎ তার হৃকের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হ’য়ে উঠলো অস্পষ্ট, উত্তপ্ত একটা ঢেউ। সে তার ঠোট কামড়ে ধরলো, একবার আঙুল চালিয়ে গেলো চুলের

সূর্য্যাস্ত

-৭-

ভিতর দিল্লি ; চলে' হাবার আগে কী বলা যায়, খুঁজতে লাগলো ।

কিন্তু এবারেও তাপসীই বললে :

‘না কি ভিতরে এসে আর-একটু বসবেন ? হুঁজন না হ’লে
সত্যি কোনো কথা বলা যায় না ।’

মিহির বললে, ‘না, বাই এবার ।’

‘আর-একদিন আসবেন ?’

সেই অর্ধ-আলোর মিহিরের দৃষ্টি তাপসীর চোখ অন্বেষণ করে’
ফিরলো । মিললো তাদের দৃষ্টি, মুহূর্তকাল তারা রইলো পরস্পরের
দিকে তাকিয়ে । দৃষ্টির ঘর্ষণে অলং উঠলো ছোট একটা শিখা ;
সেই আলোর পরস্পরকে তারা দেখে নিলে । তারপর মিহির
বললে :

‘হ্যাঁ, আসবো ।’

কিন্তু তাদের আবার দেখা হবার আগে পনেরো দিন কেটে
গেলো । কী যেন, বাওয়া তার হ’য়ে উঠলো না । তেমন-কোনো
তাগিদ অনুভব করলে না মনের মধ্যে । একদিন যে দেখা হয়েছে
তারই রেশ চলেছে তার মনে । তা থেকে সমস্তটা রস সে নিঙড়ে
নিতো চায় । এমনি হয়—বারা বেশি ভাবে, তাদের । তাদের
প্রেম মন্থর । একটু আশ্বনের কথা থেকে সমস্ত মনের রঙিন হ’য়ে
ওঠবার সময় তারা দেয় । জীবনের অন্তরালে বেজে চলেছে
কোনো স্তম্ভ স্তম্ভ—না-ই বা বাইরে কোনো প্রকাশ থাকলো ।

সূর্যমুখী

মাঝে-মাঝে কোনো কাজের মধ্যে, কোনো অলস মুহূর্তে মিহিরের তাপসীকে মনে পড়তো—বেমন হঠাৎ আমরা চাঁদের কথা জাবি। আর তার মন ভরে' যেতো অদ্ভুত শাস্তিতে। ভাবতে ভালো লাগতো। ভাবতেই যখন এত ভালো লাগছে কী হবে গিরে ?

এতে করে' একটা বিপদ এই যে অনেক সময় হয়-তো যা হ'তে পারতো, তা হয় না। শেষ পর্যন্ত কসকে যায়, নিবে যায়। পার হ'রে যায় সময়—ভাবনা নিয়েই যার জীবন, সে থাকে 'নিশ্চেষ্ট বলে'। সে-আশঙ্কা ছিলো মিহিরের বেলায়। এখানে যদি শেষ হ'তো, মিহির সেটাই মেনে নিতো স্বাভাবিক ও অনিবার্য বলে। কিন্তু এক বিকেলে হঠাৎ তাপসীর সঙ্গে তার দেখা হ'রে গেলো মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে। সে লেখবার প্যাড কিনছিলো—পিছন থেকে অত্যন্ত যত্নেরে কে বলে' উঠলো :

‘এই বে !’

কিরে ডাকিরে সে দেখলো, তাপসী।—‘বাঃ, আপনি !’

‘ভাগ্যিস আগে একদিন আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো—নয় তো আপনাকে তো চিনতেই পারতুম না। পাশ কাটিয়ে চলে' যেতুম।’

‘কতদিন হয়তো গেছেনও।’

‘হয়-তো গেছিও !’ তাপসী প্রতিধ্বনি করলে। ‘হয়-তো

স্বৰ্ণায়ুৰী

একই ট্রামে আপনার সঙ্গে অনেকটা রাস্তা গেছি। ভাবতে পারেন !’

মিহির দোকানির হাত থেকে তার প্যাকেট নিলে। একটু হেসে বললে, ‘কত সময় বে আমাদের জীবনের নষ্ট হয়েছে তা আমরা জানতে পারিনি বলে’ই রক্ষে। নয় তো বাঁচতে পারতুম না।’

‘আর-একটু সময় নষ্ট করবেন ?’

‘চলুন।’ ছ’জনে একসঙ্গে যেতে লাগলো।—‘কোনদিকে ?’

‘কোথায় গেলে কার্পেটের আসন পাওয়া যাবে বলতে পারেন ?’

‘না তো।’

‘জানেন না ?’

‘বেখা যাক খুঁজে।’

মার্কেটের ঠাণ্ডা, আধো-অন্ধকার অলি-গলি দিয়ে তারা দুরতে লাগলো। মিহির বললে, ‘এই জিনিসপত্র কেনা আর-এক জাদু।’

‘কেন, আমার তো বেশ ভালোই লাগে। বোধ হয় পরলা ধরচ করতে পেরে আমার ভ্যানিটি খানিকটা খুলি হয়।’

‘যদি সেটা বাজে ধরচ হয়। নেহাৎই দরকারি জিনিসের জন্ত ধরচ করতে হ’লে আমাদের কেমন যেন রাগ হয়।’

‘তা তো হবেই। আমাদের বেঁচে যে থাকতে হবে, এ তো

সূর্য্যযুধী

জানা কথা । সেটা আমরা একরকম ধরেই নিই । সে-জন্ত যে-
খরচটা করতে হয়, সেটা, তাই, বড় বেশি গায়ে লাগে । মনে
হয়, পরসাতা একেবারে জলে গেলো । বদলে কিছুই পেলুম না ।
যে-খরচ আমাদের না-করলেই নয়, তাতে কোনো মজা নেই ।’

‘হুদি দোকান অত খারাপ লাগে তো সেই জন্তেই । হুদি
লোকটি যে পৃথিবীতে আত্মাহীনতার একটা প্রচলিত দৃষ্টান্ত তা
তার নিজের দোষে নয়, তার পণ্যের দোষে । সংসারে বাড়িওয়ালার
নামক জীব বোধ হয় সব চেয়ে বেশি বিধেবির পাত্র । অথচ—
তার কী দোষ ? এদিকে এসেঙ্গের দোকানে গিয়ে অত্যন্ত
বেশি খরচ করতে শুধু যে আমাদের খারাপ লাগে না, তা নয়,
খরচ করতে পেয়ে আমরা খুসি হই । সেখানে, এমন কি, দোকানির
কাছে আমরা কৃতজ্ঞ বোধ করি । সে-লোকটিকে আমাদের ভালো
লাগে, যদিও হুদি কি বাড়িওয়ালার সঙ্গে তার মূলগত কোনো
পার্থক্য নেই ।’

পাওয়া গেলো দোকান । তাপসী তার জিনিস কিনলে ।
মিহির সেটা হাতে তুলে নিয়ে বললে : ‘এখন বাড়ি যাবেন তো ?’

‘আপনি ?’

‘আমি বাড়ি যাবো । চলুন আপনাকে ট্রাম পর্য্যন্ত পৌছিয়ে
দিয়ে আসি ।’

‘আপনিও চলুন না আমাদের ওখানে ।’

স্বর্গদূতী

‘এখন ?’

‘নোও কী ?’

‘এখন কী করে’ হয় ?’

‘কিছুতেই হয় না ?’

মিহির দুপুরবেলার সহরে গিয়েছিলো কাজে, এই ফিরছে।
নিজেকে তার অপরিচ্ছন্ন, ধূলিময় মনে হচ্ছিলো। ঠিক এইভাবে
‘তাপসীর লগ্নে চলে’ যেতে খুঁতখুঁত করছিলো তার মন। তাই
সে বললে :

‘বাড়ি হ’রে যেতে পারি—বদি বলেন।’

‘আমি তো অনেক আগেই বলেছিলুম।’

মিহির কীপ হেসে বললে, ‘না, আজকে ঠিক যাবো।’

দু’জনে মার্কেট থেকে বেরুলো। তাপসীর ট্রাম ধর্মভার
—বেশ খানিকটা হাঁটতে হবে। তাপসী মিহিরের নিবৃত্ত হাতের
দিকে তাকিয়ে বললে : ‘আমাকে না-হয় একটা বিন্—বদি
অন্ত্রবিধে হয়।’

‘না-হয় অন্ত্রবিধে হ’লোই একটু।’

একটু সময় তারা চুপচাপ হাঁটলো। এম্পায়ার থিয়েটারের
দেয়ালে সিনেমার অলঙ্কার পোস্টার : এক অর্ধ-নগ্ন, অর্ধ-শায়িত
স্ত্রী-মূর্তি এক পা উপর দিকে তুলে দিবে হানছে—সে-হানিতে
সম্পূর্ণতম, বিত্তমতম নিরুদ্ভিতা।

‘তবু আমরা গরু করে বলি’, মিহির বললে, ‘যে এটা হচ্ছে পৃথিবীর সত্যতম যুগ।’

‘কিন্তু সাধারণ লোকের জ্ঞান কী ব্যবস্থা করবেন? সবাই তো আর তারার গতিবিধি লক্ষ্য করে’ কি রবীন্দ্রনাথ পড়ে’ অবসর কাটাতে পারে না।’

‘যা-ই বলুন না, রোজ এত লোক এই-সব জিনিস দেখছে, এক দেখে উল্লসিত হচ্ছে, তা ভাবলে আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না।’

‘একমাত্র সাধনা এই যে না-দেখেও পারা যায়। যার যেমন খুসি তেমনি জীবন কাটাতে পারে।’

‘সবাই পারে?’

‘কেউ-কেউ তো পারে। যারা পারে না, তাদের নিজেরের কোনো জীবন নেই। তারা প্রত্যেকে বিরাট গণ-মনের এক-একটা স্পন্দন।’

‘তা হ’লে তো সব ভাবনাই ঘুচলো।’

‘আপনার নিজের যাতে কোনো ভাবনা না থাকে, আজকালকার সত্যতার পেটাই তো উদ্বেগ। তারা সব ভেবে রেখেছে আপনার হ’য়ে। আপনি কী করবেন। কী পড়বেন, কেমন করে লক্ষ্য কাটাবেন। ছুটিতে কোথায় যাবেন। এটা কি কম আশ্রয়! আর আপনার হৃদয়ে কী প্রবল গণ-উচ্ছ্বাস এসে লাগে, যখন আপনি দেখেন অল্প সবাই তা-ই করছে, তা-ই

সূর্য্যবুধী

পড়ছে, সেখানেই যাচ্ছে। অসংখ্যের একজন হবার মহৎ আনন্দ প্রতি মুহূর্ত্তে পাচ্ছেন আপনি।’

মিহির বললে, নিঃশ্বাস ছেড়ে, ‘জন-গণ-মন-অধিনায়ক জয়, হে।’

‘অবিশ্রি হতাশ হবার কিছু নেই। পৃথিবীর বা-ই হোক, আমার কিছু এসে যায় না। আমি তো আছি নিজের মনে।’

‘তা কি পারেন—সব সময়? পৃথিবী আপনাকে কখনোই একবারে একা থাকতে দেবে না।’

‘তবু—যদি বুঝতে পারি, যদি ছটফট করতে পারি, তা হ’লেই মনে করবো বেঁচে গেলুম।’

তার ধর্ম্মতলার এসে পড়লো। রাত্তা পার হ’রে তাপসী বললে: ‘ক্লান্ত লাগছে। সম্প্রতি এই বিহ্বল সত্যতার অন্ততম নৃষ্টি ট্রামগাড়ির ভক্ত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।’

সেই সন্ধ্যা মিহির কাটালো তাপসীর সঙ্গে। সে তাকে পেলো ছোট ঘরে, সামান্য তার আসবাব। সেখানে বলে’ সে পল্লবের কাজকর্ম্ম করে। নিচু একটা ক্যানভাসের ইঞ্জি-চেয়ারে বলে’ সে একটা চিঠি পড়ছিলো। তার পরনে সাদা তাঁতের শাড়ি, লাল মধ্যমলের চটিতে ঢোকানো তার পা। মিহিরকে দরজার কাছে দেখে চিঠিটা খামে ভরে’ রেখে সে উঠে দাঁড়ালো।

—‘যাক, আপনি সত্যি-সত্যিই তা হ’লে এলেন।’

সূর্যাস্ত

‘আপনার কাজে বাধা দিলুম ?’

‘মোটের ও না। এখানেই বসবেন—না, পাশের ঘরে যাবেন ?’

‘এখানেই তো ভালো। ছোট ঘরই আমার ভালো লাগে।’

ঘরে যে আর একটিমাত্র চেয়ার ছিলো, মিহির তাতে বসলো।

তাপসী জিজ্ঞেস করলে :

‘এতদিন কী করলেন ?’

‘কী করলুম ? কই, কিছুই তো মনে পড়ছে না।’

‘সেটা এমন-কিছু খারাপ নয়, ভেবে দেখতে গেলে।’

‘না। জীবনের নিবিড়তম স্থরের সুহৃৎ, বরং। অনেকে বলবে আলস্য—কিন্তু সে-আলস্য শুধু শরীরের।’

‘জানি। মনটা ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত আকাশ ভরে’ : নিজেরই ভিতর থেকে উৎসারিত কোনো স্রোত।’

‘মাঝে-মাঝে এমন হয় যে যেদিকে তাকাই সেখানেই মনে হয় কী রহস্য। নতুন কোনো দৃষ্টিতে জীবনকে দেখবার মত। একটা লাইন পড়লে পাঁচ মিনিট চুপ করে’ থাকতে ইচ্ছে করে। এক সঙ্গে এত কথা মনে আসে যে কোনোটাই লেখা হয় না। এক কথার, কাজ থাকে বলে, তা হয় না কিছুই।’

‘কেন যে মানুষকে কাজ করতেই হবে !’

‘কেন যে সবাইকে কাজ করতে হয় তা তো জানেন।’

‘সে-কথা নয়। যদি নিছক জীবিকার জন্য কাজ হয়, তাতে

মূৰ্খ্যমুখী

বোধ হয় বিশেষ-কিছু এসে যায় না। সেটা নেহাৎই যান্ত্রিক, মন সেখানে থাকে নিঃসাড় হ'য়ে।'

‘না কি—মনকে তা নিঃসাড় করে’ তোলে?’

‘জানিনে,’ তাপসী হেসে বললে, ‘অভিজ্ঞতা নেই।’

‘ছেলেবেলা থেকে আমাদের শেখানো হয়েছে কাজের মাহাত্ম্য। কোন্ বালক তার জন্মদিনে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের আত্মজীবনী উপহার না পেয়েছে? এত বলবার দরকার হয় কেন? মাহুকের স্বভাবে নিশ্চয়ই কাজের প্রতি সহজ একটা বিমুগ্ধতা আছে।’

‘যদি না সে-কাজে আনন্দ থাকে।’

‘যদি না সে-কাজে আনন্দ থাকে,’ মিহির বললে, ‘যদি না সে-কাজে খানিকটা খেলা হয়। কিন্তু আজকালকার সব কাজই এমন ছাঁচে-ঢালা, ব্যক্তিকে তা কোনোখানে স্পর্শ করে না। কিন্তু মাহুকে কেনো একটা অবলম্বন দিতে হয়—কোনোভাবে তাকে জানানো চাই যে সে সার্থক। সেইজন্য বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের দরকার। কাজের জন্তই কাজ।’

‘আরো আছে। টাকার জন্ত কাজ। যে-আনন্দ মাহুকের কাজের ভিতর দিয়েই পেতে চায়, তার বহলি হিসেবে তাকে দেয়া লোভের উত্তেজনা। কেবল পরশা করারই পরম মাহাত্ম্য, তাতে বিশ্বাস না-করলে কি আপনি মনে করেন এত লোক দিনের পর দিন এমন অনাপত্তিতে অবিশ্রান্ত কাজ করে’ যেত পারতো।

সূর্যমুখী

‘কোনোখানে একটা বিশ্বাস থাকতে বাধ্য। যার যে-ধর্ম, তার সমর্থন না পেলে মানুষ কিছু করতে পারে না। সমগ্র জাতির একটা সম্মিলিত ধর্ম থাকে। এক-এক যুগে তা এক-এক রকম।’

একটু ছেঁদ। মিহির তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাপসীর দিকে তাকানো। ঝকঝক করছে তার চোখ, তার লাল পাখলা ঠোঁটের প্রান্ত ক্ষীণতম হাসিতে ঝিকানো। একটা চাবুকের মত, তার শরীর। তার সাদা সাড়ির উপর খয়েরি বুঁটি তোলা, যেন ছোট-ছোট কোঁতুহলী চোখ দুটে রয়েছে। একটু সময় মিহির তার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারলে না। তারপর সে বললে, নিজের কথার জের টেনে:

‘সব সময় আমাদের আজকাল তর, পাছে সময় নষ্ট হয়। সময় নষ্ট না-করবার এই মর্মান্তিক চেষ্টায় জীবনকে আমরা নষ্ট করে ফেলেছি।’

‘যদিও আমরা তা জানিনে। আর সেটাই সব চেয়ে খারাপ। জীবনকে আমরা ইন্টার বেয়ালের মত নিরেট করে তুলি, আর মনে-মনে বলি, খুব কবে’ খানিকটা বাঁচা গেলো। চলতি ভাষার যাঁদের বলে কুতীপুরুষ, তাঁদের যে-কোনো একজনের জীবনের কাহিনী যে-স্বরে লেখা হয় তাইতেই বোঝা যায়।’

‘আপনি যদি না-ই জানতে পারেন, তা হ’লে, আর যা-ই হোক,

সূর্যাস্থী

‘আপনাকে অস্থবী হ’তে হয় না। বিপদ তাদেরই বারা এখনো সময়-ধর্মের প্রভাবে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হ’য়ে যাননি। বারা এখনো বাঁচতে চায়; মাহুঘের একা থাকবার পবিত্র অধিকারকে বারা ছাড়তে চায় না।’

‘তারা অস্থবী হবে, তারা হুংখ পাবে। কিন্তু তাদের কোনো ভয় নেই। হয়-তো তাদের পক্ষে স্থবী হবার প্রয়োজন নেই। হয়-তো অন্ত-কোনো রকম স্থূথ তারা পেয়েছে, যাতে সমস্ত পুথিরে যায়।’

‘তা-ই আশা করা যাক।’

‘কিন্তু তা-ই যে।’

‘ঠিক জানেন?’

‘আপনি কি জানেন না?’

তাপসীর উজ্জ্বল টানা চোখের পরিপূর্ণ দৃষ্টি মিহিরের মুখের উপর এসে পড়লো। সে-দৃষ্টি যেন বড় বেশি দেখছে, মিহির চোখ নামিয়ে নিলে। প্রশ্নটা এড়িয়ে নিয়ে সে বললে:

‘আমি তবে দেখেছি আমাদের একমাত্র মুক্তি হচ্ছে আলস্তে।’

‘কিন্তু সে-মুক্তি সহজ নয়। সত্যি বলতে, কিছু না-করে’ থাকার মত কঠিন আর-কিছু নয়। মাহুঘ নিজের নিঃসঙ্গতাকে ভয় করে। আর-কিছুর জন্ত না হ’লেও, নিজের হাত থেকে বাঁচবার জন্ত মাহুঘকে কাজ করতে হ’তো।’

সূর্যাস্ত

‘না, সহজ তো নয়ই,’ মিহির একটু চূপ করে’ থেকে বললে, ‘মাসুকের সব চেয়ে কঠিন সাধনা হচ্ছে আলস্ত। আমরা যদি মাঝে-মাঝে অলস হ’তে পারতুম, তা হ’লে বেঁচে যেতুম। শান্ত, সোনালিরকম অলস। যদি মাঝে-মাঝে ভুলতে পারতুম আমাদের এই প্রাণ-ঘাতী চেষ্টা! স্থখী হবার চেষ্টায়, বুদ্ধিমান হবার চেষ্টায়, ভালোবাসবার চেষ্টায় আমরা মরে’ বাচ্ছি।’ তারপর, তাপসীকে নীরব দেখে :

‘আমাদের লেখাতেও সেই চেষ্টা। আমরা যেন এক মুহূর্ত ভুলে’ থাকতে পারিনে যে আমাদের ভালো লিখতে হবে। আত্মপ্রকাশ করবার নির্ভর চেষ্টায় আমরা আত্মহত্যা করি। সব সময় কি আত্মপ্রকাশ করতে হবে? কিছু কলে-ছড়িয়ে দিতে হয়, প্রকৃতিতে অজস্র অপব্যয়। যেখানে অপব্যয় নেই, সেখানে লাভগ্য নেই। আর এই অপব্যয়কেই আজকাল আমরা সব চেয়ে ভয় করি। সময়ের অপব্যয়কে ভয় করি, চিন্তার^১ অপব্যয়কে ভয় করি। আমাদের চিন্তার প্রত্যেকটি ছেঁড়া স্নাতোকে আমরা লেখার মধ্যে গুঁজে দিতে চাই, জমিয়ে রাখি সেগুলো মনের মধ্যে। হারাতে পারিনে। সব সময় আমরা আত্ম-সচেতন, সতর্ক। জীবন থেকে সব সময় কিছু-না-কিছু টেনে বার করতে আমরা প্রস্তুত। আমাদের ঝাঁকি ঘেবার উপায় নেই। কখনো আমরা নিজেকে একটু ছেড়ে দিইনে, বিশেষ যাইনে আশে-পাশের

সূর্যাস্ত

আবহাওয়ার, কখনো ভরে' উঠিনে নিশ্চিত শান্তিতে। কখনো জোর করে' বলতে পারিনে—বয়ে' গেলো! সব সময় আমরা ভাবি, ভাবি, ভাবি : 'বে-কোনো জিনিস নিয়ে ভাবি, নিজেকে নিয়ে সব চেয়ে বেশি ভাবি।'

এমনি তারা কথা বললে, শীতের সন্ধ্যা ভরে' ছোট সেই ঘরের নিবিড় আবহাওয়ায়। বাইরে, রাত্তার ধোঁয়া জমে' উঠলো, ধোঁয়া কেটে গেলো, কালো আকাশে ঝকঝক করে' উঠলো তারা, পূর্বের আকাশে দেখা দিলো কালপুরুষ। আর তারই কোণ ঘেঁষে কখন উঠে এলো কৃষ্ণপঙ্কের কোণ-ভাঙা স্নান চাঁদ। তারা ছ'জন বখন একসঙ্গে বেরিয়ে এলো বারান্দায়, হঠাৎ সেই চাঁদ পড়লো তাদের চোখে। ছ'জনে একসঙ্গে থমকে দাঁড়ালো, স্তব্ধ হ'য়ে গেলো। আর একটু পরে :

'চাঁদ!' রুদ্ধস্বরে তাপসী বলে' উঠলো।

'আপনার কি মনে হয় চাঁদ জানে?' মিহির জিজ্ঞেস করলে।

'কী জানে?'

'এই—এতগণ আমরা যা-কিছু বলছিলুম। চাঁদ কি মনে-মনে হাসে?'

তাপসী কিছু বললে না। তারা আরো কয়েক পা এগিয়ে এলো সিঁড়ির দিকে। মিহির আবার বললে, 'কেন আমরা এত কথা বলি, আকাশে বখন চাঁদ রয়েছে?'

সূর্য্যবুধী

বাইরের ঠাণ্ডার তাপসী হঠাৎ একটু কেঁপে উঠলো। খুব আশ্বে-আশ্বে সে বললে, 'চাঁদ জানে।'

'হ্যাঁ—চাঁদ তো সেই কথাই বলে যা আমরা সবাই বলতে চাই, কিছুতেই বলতে পারিনে।' বলে' মিহির সিঁড়িতে নেমে এলো। তারপর একবার মুখ কিরিরে তাপসীর দিকে তাকালো— আর হঠাৎ তাপসীর ঝেং-ঝাঙ চোখের উপর থেকে কী বেন একটা আবরণ সরে' গেলো, উজ্জল, উত্তপ্ত স্রোতে নেমে এলো তার দৃষ্টি, অন্ধকার বস্তার মত, তারাময় ঘূর্ণির মত। আর-কোনো কথা হ'লো না।

রাস্তায় বেরিরে মিহির আবার শীতের ষেত চাঁদের দিকে তাকালো। আর তার মনে ভরে' গেলো এক আশ্চর্য্য শাস্তিতে। চাঁদ তাকে স্পর্শ করেছে, চাঁদ তার বুকের উপর লুটিয়ে পড়ে' বলছে, 'ভয় নেই।' হঠাৎ তার বুকের মধ্যে নতুন এক শাস্তির চেতনা। সে দ্রুতপদে কয়েক পা হাঁটলো, তারপর তার মনে পড়লো মৃণালের কথা। আশ্চর্য্য—মৃণালের কথা আজ সে কী সহজে ভাবতে পারছে। সে আর তাঁকে ভয় করে না—তার বুকের মধ্যে আজ চাঁদের আশ্চর্য্য শাস্তি। 'আ—এইবার সে জরী হবে মৃণালের উপর। এতদিনে তার মুক্তি। কী দীর্ঘ, দীর্ঘ যাত্রা সে পেয়েছে—রাজির সেই শৃঙ্খল, অন্ধকারের পাবাণ-নিষেধণ। নিজের মধ্যে সে দীর্ঘ হ'য়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু যে

সূর্যাস্ত

চাঁদকে ভুলে' ছিলো। সে জানতো না নেপথ্যে অপেক্ষা করছে
চাঁদ—একদিন তা বেরিয়ে আসবে সময়ের ঘোমটা ছিড়ে।
আজ সেই উন্মোচন। আজ সে চাঁদকে পেয়েছে—তার বুকের
মধ্যে, তার বুকের মধ্যে। তা তাকে সম্পূর্ণ করে' তুলবে,
ফিরিয়ে আনবে তার অখণ্ডতা। এইবার তার মুক্তি।

আর সেই চাঁদ মিহিরকে ডরে' তুললো। যে-চাঁদ আমাদের রক্তের সমুদ্রকে আকর্ষণ করে, যার সঙ্গে আমাদের রক্তের চিরকালের অতীন্দ্রিয় সংবেদন। সেই সুদূর, সেই মধুর, সেই নির্ভুর চাঁদ! যা আমাদের উতলা করে, উদ্ভাস্ত করে; ঘুমের মত বা নরম, হত্যার মত বা ভীত; বিরহ-রাত্রির মত মদির, সমুদ্রের মত হিংস্র; যার স্পর্শে রক্তে বিব অলে' ওঠে, যার স্পর্শে অনির্কচনীয় শান্তি; যার জন্ত আমরা মরতে পারি, যার জন্ত আমরা তারা হ'য়ে উঠতে পারি; যা আমাদের মধ্যে প্রেরণ করে অদ্বুত খেয়াল, অসম্ভব কল্পনা; যার জন্ত আমরা ছুঃসাহস করতে পারি, নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে পারি, উপলব্ধি করতে পারি আমাদের চরম নিজত্ব। এবং যার জন্ত, বিপর্যাস্ত, উন্মথিত, উন্মত্ত, আমরা নিঃশেষ হ'য়ে যেতে পারি অপরাধ সর্বনাশে।

আশ্চর্য্য, মিহির সহস্রবার নিজের মনে বললে, আশ্চর্য্য। হঠাৎ এ নেমে এসেছে প্রবল, অন্ধকার শোতে, ভেঙে পড়েছে তাদের উপর ক্ষুধিত সমুদ্রের মত। এখন আর-কিছু করবার নেই, কিছু ভাববার নেই। রক্ত উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠছে চিরন্তন চাঁদের টানে, লুটিয়ে পড়ছে তার শরীর-প্রান্তে—আকাশের অস্পষ্ট-শুভ্র চাঁদের মত সেই তার শরীর!

প্রায়ই সে যেতো তাপসীর কাছে। কখনো থাকতো দলের

সূর্য্যমুখী

কেউ—সাধারণ আজ্ঞা হ'তো। কখনো সেই ছোট ঘরে দু'জনে বসে' একটু-একটু করে' চা খেতে-খেতে আন্তে-আন্তে কথা বলা—এলোমেলো, খেরালি, অলস কথা—যখন যেমন মনে আসে। কোনোদিন তাপসীর কোনো বন্ধু আসতো গাড়ি নিয়ে : দল বেঁধে তারা যেতো সহরের বাইরে, শীতের কলোমলো সকালবেলার, রাস্তার উপর হালকা-নীল কুমরাশা, বাতাসে ধার। গাড়ি ছুটতো ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল যশোর রোড দিয়ে, বাতাস মুখে লাগতো চাবুকের মত, আঙুলের ডগাগুলো অসাড় হ'য়ে উঠতো : তাপসীর ধোঁপা পড়তো ভেঙে, বিস্ফারিত হ'তো চোখ, পিছন দিকে মাথা হেলিয়ে হঠাৎ সে উচ্চস্বরে হেসে উঠতো। আর তার পাশে বসে' মিহির অল্পতব করত। বা এর আগে সে কখনো অল্পতব করেনি। এই উজ্জল আকাশের মধ্যে প্রসারিত হ'য়ে সে অস্পষ্ট দিগন্তে বিশেষ গেছে—এই আকাশ তো সে-ই, সে-ই এই বিশ্ব, বিশ্বের প্রাণ-কেন্দ্র সূর্য্য। বাতাসে কী নেশা, এই আলো-কে সে শোষণ করছে মনের মত। সে মাতাল হ'য়ে উঠতো তাপসীর চুলের গন্ধে, তার মুখের কথা কবিতা হ'য়ে উঠতে চাইতো। সে ঠাট্টা করতো, সে হেসে উঠতো, সে কী বলতো জানতো না। সে যেন চোখের নামনে বেখতে পেতো সমুদ্রে-ঘেরা সমুদ্র দ্বীপ ; বিশাল, কালো নদীর উপর দিয়ে আন্তে-আন্তে চলেছে শান্তল-উঁচোনো জাহাজ ; অদূত সমুদ্রের জীব, উদ্ভিদের মত বেখতে ; নৌরতময়, তারাময়

সূর্য্যসুখী

আত্মিকার অলস রাত্রি। উদ্যম হ'য়ে উঠতো তার করনা, বা-কিছু সে পড়েছে আর ভেবেছে, বা-কিছু সে লোকের মুখে শুনেছে, যত ছবি ঘুমের আগেকার সুহৃৎ মনে-মনে সে তৈরি করেছে—সব যেন এক নিবিড় কেন্দ্রীভূত সুহৃৎ একসঙ্গে ভিড় করে' আসতো—আর সেই আনন্দে মগ্ন, সুহৃৎের জন্ত তাপসীকেও সে ভুলে' যেতো।

কি কখনো সমস্ত দিন তারা বাইরে থাকতো, কোনো রবিবার, মল একটু বড় করে' নিয়ে চন্দননগর কি ডায়মণ্ড হার্বর। একটা আঙনের রেখার মত কেটে যেতো ঘণ্টাগুলো। মিহিরের সমস্ত শরীর আনন্দে শিরশির, শিরশির করতো। এত হাসি যে কোথা থেকে আসে! যখন সে খেতো, যখন সে ঘাঁধের উপর পা ছড়িয়ে বলতো, যখন সে তীরের মত ছুটে-বাওয়া কাঠবিড়ালির দিকে তাকাতো, যখন পারের নিচে শুকনো পাতাগুলোকে গুঁড়ো করে' দিতে-দিতে হাঁটতো—সমস্তই যেন আশ্চর্য্য, বিশেষ-কিছু, চোখে যেটুকু দেখা বাজে তা থেকে অস্ত-কিছু। তারপর বিকেলের দিকে ক্লান্ত, গ্লি-মলিন, রুক্ষচুলে শুষ্কস্বখে বাড়ি করে' আসা—সূর্য্যময় ক্ষয় নিয়ে। এত ভালো লাগতো যে শরীর-ভরা ক্লান্তি নিরেও রাখে শুতে যেতে ইচ্ছে করতো না, ঘুম আসতো না বিছানায় শুয়ে।

আর কখনো-কখনো, আর কেউ না-থাকলে, ছ'জনে তারা বেরতো—কোথায়, তা'তে কিছু এসে যায় না। যে-কোনো রাজ্য,

সূর্য্যসুখী

যে-কোনো জায়গা—যতক্ষণ তারা একসঙ্গে থাকে। তাপসী ভালোবাসতো। শীতের ছপুর্বে ঘুরে বেড়াতে—নিছক বেড়ানো, কোনো উদ্দেশ্য না নিয়ে। ভালোবাসতো ট্রামের জানলা দিয়ে ময়দানের দিকে তাকাতে, ভালোবাসতো চৌরঙ্গি। কখনো তারা মার্কেটে গিয়ে খামকা কোনো জিনিস কিনতো, কখনো যেতো মিউজিয়মে, মাস্তবের ক্রমবিবর্তনের বিভিন্ন স্তরের কঙ্কাল দেখতে—ক্লাস্ত বোধ করলে কোমো দোকানে চুকে পড়তো চায়ের জন্ত। কলকাতাকে তারা যেন নতুন করে আবিষ্কার করলে।

এমন বিষয় নেই তারা যা আলাপ না করতো। শুধু একটা কথা তারা ছ'জনেই এড়িয়ে চলতো, মিহিরের বাড়ির কোনো প্রসঙ্গ কখনো উঠতো না। তাপসী কোনো প্রশ্ন করতো না, মিহির দৈবক্রমেও কিছু বলতো না। সেই একমাত্র নিষিদ্ধ ক্ষেত্র, যেখানে তারা, কখনো ঢুকতে পারবে না। সমস্ত কলকাতা তাদের, কিন্তু ঐ ছোট একটুখানি জায়গা চিরকাল বাইরে থাকবে। মিহির কখনো তাপসীকে তার বাড়িতে আসতে বলতো না; এবং তার বিসদৃশতা তাপসীর যেন চোখেই ঠেকতো না। সত্যি সে কিছু ভাবতো না, অথাক হ'তো না; সে ব্যাপারটাকে যেনে নিঃসেইছিলো। তাতে কী এসে যায়? সে-ও কখনো ভ্রততার ছলেও মিহিরের কাছে তার ত্রীর উল্লেখ করতো না। দুকতে

স্বাধীনতা

পারতো, সে তা চায় না। কেন চায় না? কী হবে ভেবে
আর ভাববার সময়ই বা কোথায়।

তুই এই ব্যাপারে হৃৎকনের নিশ্চিত সত্যতা—কোথাও তার
এতটুকু চিড় নেই। তাই বলে সেটা কোনোরকম তার হ'য়ে
ছিলো না তাদের মনে; তারা তা একেবারে ভুলেই থাকতো।
তাপসীর এ-কথা কখনো মনেই হয়নি যে সে অস্ত্র কারো
অধিকার লঙ্ঘন করছে। আর মিহির কখনো ভাবতো না তার
নিজের জীবনের উপর মৃণালের কোনো দখল আছে। মৃণাল
তা চেয়েছিলো, তার অস্ত্র, নির্ভর জীবনে সে তাকে জড়াতে
চেয়েছিলো। আর নয়—সেই স্বাস্থ্যরোধকারী জীব আর নয়।
নিজেকে সে ছাড়িয়ে এনেছে—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, নিজেকে সে
ছাড়িয়ে আনতে পেরেছে।

অথচ মৃণালের উপর তার কোনো বিতৃষ্ণা হ'লো না। বরং,
মৃণালের উপর যে-কঠিন দৃষ্টি নিয়ে সে উঠে এসেছিলো রাজির
গল্পর খেকে, তা গলে' গেলো, মিলিয়ে গেলো। নিজেকে সে আর
দৃষ্টি করে না, তাই মৃণালকেও দৃষ্টি করবার দরকার নেই। আর
তার কোনো রাগ নেই কারো উপর। জীব সঙ্গে সে আত্মকাল
অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ; সহজে সে তার দিকে আঁকাতে পারে,
সহজে কথা বলতে পারে। সে তাকে পরাস্ত করেছে; এখন,
তাই, তাকে অনারাসে দয়া করা যায়। সে আর আশলে

স্বর্ঘ্যমুখী

আনবার মডই নয়; তাই তাকে একটু স্নেহ করতে কোথাও বাধে না। যেমন আমরা স্নেহ করি গোয়া বিড়ালকে, মাঝে-মাঝে তাকে নিয়ে একটু সময় নষ্ট করি। জীব প্রাতি মনের প্রবল বিশ্বস্ততা যে সে কাটিয়ে উঠতে পারলে, তাতে তার উপর তার জর সম্পূর্ণ হ'লো।

রাত্রে সে বাড়ি ফেরে, তাপসীতে আচ্ছন্ন হ'রে। মৃণাল অপেক্ষা করে' আছে চেয়ারে বসে', বরাবর যেমন করেছে। মিহির ঘরে ঢোকে, মুচকি হাসে। সে-হাসি মৃণালের অস্ত্র নয়; তবু, মৃণালের দিকে তাকিয়েই হাসে।

তার শব্দ শুনে হৈমন্তী উঠে আসেন :

'ক'টা বেজেছে রে ?

মিহির ঘড়ির দিকে না-তাকিয়ে বলে, 'এই লাড়ে দশটা হবে।'

'এত দেরি করিল কেন ?'

'দেরি হ'রে যার।'

'এই শীতের মধ্যে মৃণাল বলে' থাকে।'

'থাকে কেন ? আমি কি বলি ?' তারপর বলে হেসে :

'না-হর মুকলোই। তুমি যা করতে পারতে, মৃণাল তা পারবে না ?'

'আর-একটু আগে কিরলোই তো হয়।'

সূর্যমুখী

‘বতাই বেশি করি, গরম ভাত ভো নিশ্চিত।’

খেতে বসে’ সে এমনি করেকটা কথা বলে। ভালা-ভালাভাবে, প্রায় নিজেই না-বুঝে। যে-সব কথা তার মনের নেহাৎই উপকার স্তরের। নিজে বলে’ সে নিজেই শুনতে পার না। সারাক্ষণ তার মনের মধ্যে চলেছে অস্ত-কিছু। অস্ত-কোনো স্থর বেজে চলেছে তার গভীর চৈতন্তে, সারাক্ষণ।

ধাওয়ার পর, অনেক রাত পর্যন্ত টেবুল-ল্যাম্পের ধারে মাথা নিচু করে’ সে বলে’ থাকে। বলে’-বলে’ কবিতা লেখে। তাপসীকে স্মরণ করে’, তাপসীর উদ্দেশ্যে। ছোট-ছোট কথাগুলো যেন রাত্রির বুক চিরে তাপসীর কাছে উড়ে চলে’ যায়, এক ঝাঁক কালো পাখির মত—সেখানে, তাপসী যেখানে শুয়ে আছে, তার চুলের মত নরম অঙ্কুর সমস্ত ঘর ভরে’। তার মনে হয়, তাপসী জানে। সে জানে যে রাত্রির এই স্তব্ধ মুহূর্তে মিহির সমস্ত বিশ্বের মধ্যে একমাত্র তারই কথা ভাবছে। ঘুম আসছে না তারও চোখে। অঙ্কুরে, মিহিরের এই কথাগুলোর পাখা-ঝাপটানি সে শুনতে পাচ্ছে। তার বিছানা ঘিরে তারা ঘুরছে, উড়ছে—ছোট-ছোট, কালো পাখির ঝাঁক। লুটিয়ে পড়ছে তার বকের উপর। তাদের নরম উষ্ণতা তার শরীরে। আর মিহিরের মন অদ্ভুত এক পরিপূর্ণতার উদ্বেল হ’য়ে ওঠে: তাপসীকে সে অমৃত্যু করে, তার কাছে, তার চারদিকে, এই তার সমস্ত

সূর্যমুখী

রাত্রিতে। তাপসীর কাছ থেকে সে কখনো ঘুরে যেতে পারে না। সে প্রবাহিত হচ্ছে তাপসীর দিকে অন্ধকার, উষ্ণ স্রোতে, এই অদৃশ্য, অন্ধকার রাত্রির ভিতর দিয়ে। সে ঝরে' পড়ছে তাপসীর উপর, নীরব অজস্রতার, এই অনির্কচনীয় অন্ধকারের মত।

আর ঘরের অস্তদিকে, অম্পষ্ট ছায়াংশির মধ্যে, মৃণাল ঘুমিয়ে থাকে? ঘুমিয়ে? অন্ধকারের মধ্যে কালো চোখ মেলে', সে কি তেকে-ভেবে অবাক হ'তে থাকে? সে কি নমস্কার করে, সে কি ব্যথতে পারে? সে কি প্রার্থনা করে? সম্বল করে? সে কি মনে-মনে কিছু বলে, অন্ধকারের কানে-কানে কিছু বলে? যা-ই হোক, তাকে ঝেঁপে কিছু বোকা যায় না। সে ছায়াতে লীন। সে চির-অম্পষ্ট। আর দিনের বেলায় সে ঘুরে বেড়ায় লংলানের অসংখ্য কাজে, শান্ত, নিঃশব্দ, পোষা বিভাগের মত। যেমন বরাবর সে করেছে। নিজেকে সে ঢেলে ধের, ঢেলে ধের, তার স্বামীর পরিচর্যায়। তা-ই সে পারে, তা ছাড়া আর কিছুই সে পারে না। মিহিরের শারীরিক জীবনের তুচ্ছতম খুঁটিনাটির উপর তার হাত। এমন কখনো হয়নি যে সে জানেন শেষে বাথরুমের দরজার তার চটি না পেয়েছে, কি বিকেলে বেরোবার সময় হাতের কাছে কুঁচোনো কাপড়। কিন্তু এতদিনে সে-সব তার অভ্যেসে ঠাঁড়িয়ে গিয়েছিলো; কিছু আর তার চোখে পড়ে

সূর্য্যবুধী

না, গারে লাগে না। এ-কথা মনে করতেই সে ভুলে' গেলো যে
মৃণাল রয়েছে এই-সমস্তর বুলে।

কিন্তু হৈমন্তী লক্ষ্য করছিলেন। মা-র চোখের মত ভয়ঙ্কর
চোখ পৃথিবীতে আর নেই। দূরে থেকে, নিঃশব্দে, তীব্র, হিংস্র
দৃষ্টিতে তিনি দেখছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন তাঁর ছেলের
অস্বাভাবিক উজ্জল চোখ। আশঙ্কায় তাঁর বুক কেঁপে উঠলো।
তাঁকে জানতে হবে। মিহিরের চোখের সেই উজ্জলতাকে ম্লান
করতেই হবে। অত সূর্য্য হওয়া অসম্ভব। এত সূর্য্য হ'তে
তাকে দেয়া যায় না—তাঁর কঠিন, একাগ্র মাতৃ-সত্য তিনি তা-ই
ঠিক করলেন।

তাই একদিন সন্দের সময়, একটু আগে মিহির তাপসীর
কাছ থেকে ফিরেছে—হৃগুরবেলায় তার লেখানে খাওয়ার নিষেধণ
ছিলো—হৈমন্তী ছেলের কাছে এসে দাঁড়ালেন :

‘এতক্ষণে ফিরলি! চা খাবিনে?’

‘না।’

‘খেয়ে এসেছিল?’

‘আচ্ছা, মাও এক পেয়াল।’

‘চা খেয়েছিল একবার?’

‘ও—সে কখন, এখন আর-একবার স্বচ্ছন্দে খাওয়া যায়।’

‘কোথায় খেলি চা?’

সূর্যমুখী

‘এই—ওদের বাড়িতেই।’

‘ওখানেই ছিলি এতক্ষণ?’

মিহির তার মা-র মুখের দিকে একবার তাকিয়ে চুপ করে
রইলো। বিস্ত্রী লাগছিলো তার এ-সব প্রশ্ন। তার মা-র
দাঁড়াবার ভঙ্গিটাও তার ভালো লাগলো না। তিনি যেন কোনো
উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন, মনের মধ্যে কোনো স্থির লক্ষ্য। কিন্তু
কেন? নিজের কঠিন ঠাণ্ডা ইচ্ছাকে প্রসারিত করবার কেন
এই চেষ্টা—সব সময়, সব সময়?

হৈমন্তী আবার জিজ্ঞেস করলেন: ‘ওখানেই ছিলি এতক্ষণ?’

‘ওখানেই ছিলাম।’

‘কাদের বাড়ি—যেখানে গিয়েছিলি?’

‘এক বন্ধুর বাড়ি।’

‘কে সে?’

এতদিনের মধ্যে মিহির কখনো বাড়িতে তাপসীর নাম উচ্চারণ
করেনি। সম্পূর্ণই যে ইচ্ছে করে’ করেনি, তা নয়; কোনো
দরকার হয়নি, কোনো কারণ ঘটেনি। কারণ ঘটলে হয়-তো
করতো। তবে এটা ঠিক যে তাপসীর সম্বন্ধে বাড়িতে যে কিছু
বলা হয়নি, তাতে সে খুশিই হয়েছিলো। সব কথাই বলতে
হবে, তারই বা কী মানে আছে? কোনো-কোনো কথা হয়-তো
না-বলাই ভালো।

সূর্যমুখী

হৈমন্তী আবার জিজ্ঞাস করলেন, 'কে সে?'

রাগে মিহির দ্বন্দ্ব হ'য়ে গেলো। মা তার উপর আবার তাঁর জোর খাটাতে চাচ্ছেন—তাঁর নির্মম ইচ্ছার জোর। তাকে উদ্বোধিত, উন্মুক্ত না-করে' তিনি ছাড়বেন না। মা-র কাছে সে কখনো মিথ্যে বলতে পারে না, যেমন সে পারে না নিজের মাংসের মধ্যে ছুরি চুকিয়ে দিতে। শারীরিকভাবে তা অসম্ভব। এবং হৈমন্তী তা জানেন। জেনে সেটা ব্যবহার করতে চান, নিজের উদ্দেশ্যে, নিজের অধিকার-লোভের চরিতার্থতার।

আর, মিহির বতকণ চূপ করে' আছে :

'তুই তো আজকাল মোটে বাড়িতেই থাকিসনে', হৈমন্তী বললেন। যত্নস্বরে, শাস্তভাবে। তাঁর কথার সুরে কোনো অভিযোগ নেই, আক্ষেপ নেই। তিনি কেবল একটা ঘটনার উক্তি করছেন। শান্ত, নিশ্চল তিনি দাঁড়িয়ে, স্তম্ভের মত কঠিন। কেন্দ্রীভূত ইচ্ছার স্তম্ভ। আনন্দ তিনি হবেন, না; তিনি বেকবেন না কিছুতেই। মিহির তাঁর দিকে তাকালো—আর তার শরীরের গাঁটগুলো যেন শিথিল হ'য়ে যেতে চাইলো।

তবু সে নিজেকে শক্ত করে' আঁকড়ে ধরলো। সে-ও ছাড়বে না। 'ই্যা, শীতকাল—বেড়াতে বেশ ভালো লাগে'; বেশরোয়া হালকাসুরে সে বললে।

'তোরা এই বন্ধু বার বুঝি লসে?'

সূর্যমুখী

‘অনেকেই যার।’

‘কে এই বন্ধু?’ হৈমন্তীর মুখের একটি পেলী নড়ছে না।
তার চোখ ছেলের মুখের উপর স্থির-নিবদ্ধ, উদাসীন।

মিহির একটু চুপ করে’ রইলো; তারপর আন্তে-আন্তে, স্পষ্ট
করে’ বললে, ‘তার নাম তাপসী। সে একটা কাগজ চালায়—
আমি লিখি।’

‘ও।’

মিহির আবার বললে, ‘সে নিজেও লেখে—জাখোনি—পল্লব
কাগজে? প্রায়ই সে এখানে-ওখানে বেড়াতে যায়—আমাকে
ধেতে বলে সঙ্গে।’

এইবার হৈমন্তী বললেন : ‘তা তুই তাকে মাঝে-মাঝে আসতে
বললেই পারিস্। সেটা তো ভালোও দেখায়। না-বললেই
ভালো দেখায় না।’

এটা মিহির আশা করেনি। অবাক হ’য়ে সে তার মা-র
মুখে তাকালো। আ, তাঁকে হার মানানো সহজ নয়। তিনি
গভীর। ফিরিয়ে দিতে তিনি জানেন। মিহির একটা সিগ্রেট
ধরালে, তারপর বললে :

‘বলবে একদিন।’

‘একদিন তাকে চা খেতে বল্। মৃণালকে বলে রাখিস্—
সব ব্যবস্থা করে’ রাখবে।’

সূর্যমুখী

মিহির তার নিচের ঠোট কামড়ে ধরলো। আ—সে বোঝে, মা-র প্রত্যেকটি কথাই অন্তরালের তীক্ষ্ণ ইঙ্গিত সে বোঝে। প্রত্যেকটি কথা বিবের কৌটার মত, তার রক্তে। রাগে ফেনিল হ'য়ে উঠলো তার রক্ত। কিন্তু কিছু বলবার উপায় নেই। লজ্জা করতে হবে চুপ করে'। তার রাগ যে জ্বলে উঠবে তীব্র কথায়, সে-সুযোগও মা তাকে দেবেন না। বিবের বুধুধ গোপনে ফুটে উঠবে—বিব বার করে' দেবার রাস্তাও খোলা নেই। বেশ, তা-ই হোক ভবে। সে-ও কিছু বলবে না। চুপ করে' থাকবে। চুপ করে' লজ্জা করবে। তার লজ্জা দিয়ে মা-কে ব্যর্থ, বিপর্যস্ত করে' দেবে। দেখা যাক, কার জোর বেশি।

তার জীবন বয়ে' চললো উতরোল উজ্জল শ্রোতে, তাপসীকে ধিরে। কিছু সে ভাবলে না, এক মুহূর্ত্ত ধমকে দাঁড়ালো না। টান যদি আকাশ থেকে নেমে এলোই, এমন ভীষণ-কে যে তাকে লম্বা জীবন দিয়ে জড়িয়ে ধরবে না, তাকে নেবে না হ'হাত ভরে', হৃদয়ের অঙ্গকার ভরে', লম্বের চিরন্তনতা ভরে'। তার জলন্ত জ্যোতিতে অন্তরের নির্জনতম ঘর ভরে' তুলবে না কে?

কিন্তু বাড়ির মধ্যে তার মা-র নীরব নিম্পলক চোখ। সব সময় সেই দৃষ্টি তার পিছনে, সব সময়। তার সামনে' সে স্বচ্ছ হ'য়ে যাচ্ছে, এ প্রতিষ্ট হচ্ছে তার হাড় পর্যন্ত। সব সময়, সব সময়। মিহির যখন চুল আঁচড়ায়, যখন খেতে বসে; যখন সে জলের

সূর্য্যমুখী

গেলাস মুখে তোলে, যখন টেবিলের উপর আঙুল চেপে ধরে' নথ পাগিশ করে—সেই শুষ্ক অক্লান্ত দৃষ্টি সব সময় তার পিছনে। তাপসীর উষ্ণ সৌগন্ধ্য থেকে সে যখন ফিরে থাকে, তার ভয় করে মা-র কাছাকাছি যেতে—সে যেন বিকীর্ণ করছে সেই সৌরভ, সে যেন বহন করে' এনেছে তাপসীর সস্তার নির্ধ্যাস। সে তা লুকোতে পারে না—লুকোতে সে চায়ও না। বা তার চোখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন—বুঝলেনই বা। বুঝলেনই বা—নিজের মনে সে জোর করে' বলতো। আর তবু সে এড়াতে চাইতো মা-র সেই প্রখর, নির্ধন দৃষ্টি। কিন্তু সে ভয় করে না; তার বুদ্ধিতে, তার বুদ্ধির শক্তিতে, সে ভয় করে না। সে চাইতো মা-র দৃষ্টিকে ভুলে' থাকতে, অস্বীকার করতে। এবং অস্বীকার করতো, ভুলে' থাকতো।

কিন্তু সব সময় পারতো না। যতক্ষণ সে তাপসীর সঙ্গে থাকতো, ততক্ষণ তার সম্পূর্ণ অথগুতা। ততক্ষণ সে অনাক্রমণীয়, কিছু তাকে স্পর্শ করতে পারে না। বাড়ি ফিরে এসে—সেই চোখ, সেই চোখ, সেই চোখ। তার বুদ্ধিবৃত্তির অতীত কোনো অন্ধকারে তা ফুটে রয়েছে। সে তাকে উপড়ে ফেলতে পারছে না, তাকে অন্ধ করে' দিতে পারছে না কোনো চরম আঘাতে। তা ফুটে রয়েছে—নির্নিমেষ, প্রগ্রহীন, চিরন্তন। তাকে ভুলে' থাকতে সে পারে না।

সূর্য্যমুখী

কিন্তু তাকে অস্বীকার তাকে করতেই হবে। আর, এক
তাপসীই তাকে বাঁচাতে পারে, তাকে মুক্তি দিতে পারে মা-র দৃষ্টির
সর্পিলা সন্মোহন থেকে। সেখানেই—তাপসীর সেই উষ্ণ-স্মৃতি
পরিমণ্ডলে—সুখ সেখানেই সে মুক্ত, সে চরম। তাই সে প্রতিহত
তরঙ্গের মত ভেঙে পড়তো তাপসীর কূলে : যতক্ষণ পারতো,
তারই সঙ্গে কাটাতো ; বাঁচতো তারই মধ্যে ; যখন চলে আসতো,
তখনও নিয়ে আসতো তার মধ্যে তাপসীর স্নেহতম সৌরভ।

এমনি করে' কাটলো সেই নীত। মাঘ এসে পড়লো। লাল হ'য়ে উঠছে গাছের পাতা, আকাশ অবিখ্যাত নীল। হী-হী করছে উড়ুরে হাওয়া; তবু হঠাৎ মাঝে-মাঝে বঙ্গোপসাগরে কোনো বিপ্লব ঘটে, আর শীতের মাঝখানে দক্ষিণে হাওয়া বয়, দক্ষিণে হাওয়া বয়, মদির হ'য়ে ওঠে সন্ধ্যা, রাত্রি খুলে দেয় তার চুল, ছারার আর শুঙ্কনে, সৌরভে আর রহস্তে সমস্ত পৃথিবী ভরে' যায়। আর মাঘবের রক্তের মধ্যে কিংবদন্তি উন্নীলন, সেখানে কথা কয়ে' ওঠে কোন্ অস্পষ্ট বাসনা।

একদিন তারা বেড়াতে গেলো চিড়িয়াখানায়। কথাটা তাপসীরই মনে হ'লো। মিহিরকে সে বললে :

‘জু-তে যেতে তুমি ভালোবালো না?’

‘খুব। আমার একমাত্র আপত্তি মাগুহনামের জীবন্তলোকে। লংখ্যার তারা বড় বেশি।’

‘এতই বেশি যখন, আরো ছ'জন বাড়লে কিছু ক্ষতি হবে না। চলো। মিলেস্ হিল্লোর একটি খোকা হয়েছে গুনগুম।’

সুতরাং তারা গেলো। বিকেল ছটো প্রায়। বড় দরজা দিয়ে ঢুকে তাপসী বললে, ‘কোন্ দিকে?’

‘একদিকে গেলেই হয়। এখন আমাদের ডাইনে-বামে বিধাতার বিচিত্র সৃষ্টি।’

সূর্যমুখী

‘মায় মাড়োরারি—এবং লাল মোজা পরা ভদ্রলোক’, এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাপসী বললে।

প্রথমে তারা গেলো শিম্পান্সিকে দেখতে। তারের জালে ঘেরা উঁচু খাঁচার মধ্যে নিঃসঙ্গ শিম্পান্সি। কালো, বেঁটে, বুড়ো-হ’য়ে আসা—কোনো শিরীর উদ্দাম কল্পনা-প্রসূত বাহুবলের কার্টুন। সে বলে’ আছে শরীরটাকে শিথিল করে’ দিয়ে, ছ’পা সামনের দিকে ছড়িয়ে। তার ডান হাত বুলে আছে পাশে, বাঁ হাত সে তুলে দিয়েছে কপালের উপর, দেখা যাচ্ছে তার কালো তেলের গহ্বর, কানের উপর দিয়ে বেরিয়ে-পড়া লম্বা-লম্বা কালো-নখ। তার মুখে অপরিণীম জীবন-ক্লান্তি। সে তার ঘর্ষকদের দিকে তাকাচ্ছে না; তার কালো মুখ গম্ভীর, আত্ম-বিস্মৃত। মিহির তিনবার হাত-তালি দিলে, কিন্তু তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলে না।

‘বুকের মত দেখতে!’ তাপসী বলে’ উঠলো।

‘কবির মত দেখতে,’ মিহির বললে, ‘বে-কবি চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে। বে-মেয়ে তার প্রেমিকের প্রতীক্ষা করছে, তার মত। সত্যি বলতে, আমার মত—এবং তোমার মত।’

‘দ্যাখো, আমাদের মনের ভাব অনেক, কিন্তু মুখের ভাব ধরা-বাঁধা করেকটা। রাগে আমাদের মুখ যেমন লাল আর চোখ উজ্জল হ’য়ে ওঠে, আনন্দেও তেমনি। যে-লোক এইমাত্র কারো সঙ্গে

সূর্যমুখী

‘তুমুল ঝগড়া করে’ এসেছে, তাকে দেখে তোমার মনে হবে সে এইমাত্র তার প্রেমের স্বর্গ থেকে নেমে এলো।—শিম্পাজিটা কী ভাবছে, তোমার মনে হয় ?

‘ভাবছে—এই কুৎসিত জীবগুলো কারা, অনেকটা আমার ‘মতই’ দেখতে, প্রাণপণে আমাকে নকল করার চেষ্টা করে ?’

তাপসী হেসে উঠলো।—‘সুইফট্-এর এই শিম্পাজিকে দেখা উচিত ছিলো।’

‘সুইফট্ হয়-তো করনা করতেন একটা চিড়িয়াখানা—সেখানে মানুষ খাঁচার ভিতরে, আর পশুরা বাইরে। চিড়িয়াখানা বললুম কিন্তু তাকে জেলখানা বললে ভালো হয়, কি পাগলা গারদ, কি ছোটোই একসঙ্গে। পশুরা দেখতো যে মানুষ খিদে না-পেলেও খায় ; বলপ্রয়োগ করে জীর উপর ; ক্ষুধার নিবৃত্তি ছাড়া অন্য কারণে মারে ; হত্যা করে পরস্পরকে—এবং অনেক সময় সেই হত্যাকারীদের স্মৃতিপূজা করে ; দেখতো, তারা নিজেদের কলনার দাস, পাপের ভারে জর্জর ; ঈশ্বরকে তারা খোসামোদ করে ও উপঢৌকনে খুসি করতে চায় ; দুঃখ তাদের নিজস্ব ও বিশেষ সৃষ্টি। আর তারা মাথা থেকে লেকের ডগা পর্যন্ত শিউরে উঠতো—বলতো “কী ভয়ানক, কী ভয়ানক !”’

‘এই—দ্যাখো,’ তাপসী মিহিরের হাতে মূহুঠেলা দিলে, ‘ও

সূর্যাস্ত

বোধ হয় বুঝতে পেরেছে যে আমরা ওর চেহারা নিয়ে আলোচনা করছিলুম ।’

শিম্পাঞ্জিটা তার ভঙ্গি বদলেছিলো । হাত থেকে মাথা নামিয়ে এনে সে ভালা-ভালা, তীক্ষ্ণ চোখে তার দর্শকদের দিকে তাকালো । তার পুরু ঠোঁটের ঠাঁক দিয়ে হঠাৎ ঝলসে উঠলো বড়-বড় দাঁতের লম্বা আভা । তা মনে হ’লো অনেকটা ব্যঙ্গের হাসির মত । তার গোল ছোট কেশহীন মাথার সে একবার হাত বুলোলে ; তারপর একটু সরে’ বসে’ অত্যন্ত ক্লান্তভাবে চুপ করে’ রইলো ।

‘ও কী করবে ভেবে পাচ্ছে না,’ তাপসী বললে ।

‘ও জানে যে আমরা ওর খেলা দেখবার জন্য দাঁড়িয়ে আছি । ওর মেজাজটা একটু দার্শনিক-দেঁবা, এ-সব ওর ভালো লাগে না ।’

একজন দর্শক তারের জালে বাড়ি মেরে ডেকে উঠলো, ‘হেই !’

শিম্পাঞ্জি মুখ ফিরিয়ে তাকালো, চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখলো । তারপর, তার ঘণ্টা বাজবার সঙ্গে-সঙ্গে আবির্ভূত সার্কাসের খেলোয়াড়ের মত, আত্ম-সচেতন, কর্তব্যপরায়ণ, উৎসাহহীন সে উঠে দাঁড়ালো, হু’পারে হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ অদ্ভুত একটা মুখ-ভঙ্গি করলো । দর্শকরা হেসে উঠলো । বেড়া বেঁধে দাঁড়িয়ে ককণ, বিমর্ষ চোখে সে হাত পাতলো । একটা গুঁটানো হাঁড়ির মত তার পেট, তার হাত দুটো কুড়োলের মত ঝুলে রয়েছে, তার বেঁটে পায়ের লম্বা-লম্বা আঙ্গুল দিয়ে সে অদ্ভুত, অসমান পা ফেলছে ।

সূর্য্যমুখী

অত্যন্ত হাস্তকর, কিন্তু সে এত বেশি মাহুকের মত দেখতে যে হাসির মধ্যে হঠাৎ থেমে গিয়ে অবাক হ'তে হয়।

মিহির একটা বর্ষা-চুফট ধরিয়ে তারের কাঁক দিয়ে ভিতরে কেলে দিলে। শিম্পাঞ্জি তৎক্ষণাৎ সেটা তুলে নিলে, মুখে দিয়ে প্রাণপণে টানতে লাগলো। উঠলো হাসির রোল। ছুটি ছোট' ছেলে আনান্দে চোঁচিয়ে উঠলো। কয়েকটা টান দিবেই সে সেটা ছুঁড়ে কেলে দিলে।

‘বেচারা!’ মিহির বললে, ‘ও যদি একবার নেশার স্বাদ পেতো, তা হ'লে মাহুকের প্রতি ওর একটু অন্তত শ্রদ্ধা হ'তো।’

ছ'টার মিনিট শিম্পাঞ্জি তার দর্শকদের আপ্যায়ন করলে। খাঁচার উপরকার দিকে আড়াআড়িভাবে লাগানো কাঠ সে এক লাফে উঠে ধরে ফেললো, ঝুলে রইলো, রূপ করে' পড়লো, চিং হ'য়ে শুয়ে রইলো তার উঁচু গোল পেট উপরদিকে তুলে দিয়ে, গড়াগড়ি গেলো, খানিকক্ষণ ডিগবাজি খেলো, মাথার উপর দাঁড়ালো। ছোট ছেলে ছুটি হাসতে-হাসতে যেন মরে' যাবে। তারপর ততক্ষণে-নিবে-বাওয়া সেই চুফটটা কুড়িয়ে নিয়ে চুপচপে বলে' সেটা হিঁড়তে লাগলো, তার মুখে নিবিড় একাগ্রতা। যেন সার্কাসের থেলোয়াড় তার বাজি শেষ করে' ফিরেছে, এখন নিজের আমোদের জন্ত কিছু করতে যাচ্ছে।

সূর্য্যসুখী

‘চলো’, মিহির বললে, ওকে এখন ওর বানরতমকে ‘ধ্যান করতে দাও।’

‘“ঘেরা হয়”’ তাপসী বললে, ‘ও নিশ্চয়ই মনে-মনে বলছে, “ঘেরা হয় এই মানুষগুলোকে দেখে। পরমবানরের কাছে সে প্রার্থনা করছে, “এই সূর্য্যদেব হাত থেকে আমার রক্ষা করো।”’

লাল রাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে মিহির বললে; ‘এক-এক সময় এ-কথা ভেবে সত্যি ভালো লাগে যে পৃথিবীতে মানুষ ছাড়া অন্তান্ত জন্তুও আছে।’

তারপর তারা গেলো পাখিদের ঘরে। বাইরে থেকে তাদের কানে এসে লাগলো একটা জড়ানো, মেশানো, বিশৃঙ্খল কিচির-মিচির। ‘মেয়েদের সভার মত’, মিহির বললে। ‘সবাই বলবে, কেউ শুনবে না।’

এক আশ্চর্য্য জগৎ—রঙের আর শব্দের আর নরম পালকের। উজ্জ্বলতম সব রঙের তীক্ষ্ণ প্রতিধাত। সাধা আর হলদে কুটকিওয়ালা সাধারণ ছোট-ছোট পাখি থেকে দক্ষিণ আমেরিকার অলঙ্কৃতম প্রতিনিধি—তাদের গায়ের রঙ চীৎকার করে উঠছে, তাদের দীর্ঘ পুচ্ছ কৃত্রিম বৃক্ষাধা থেকে প্রায় মেঝেতে এসে ঠেকেছে, রামধনু-রঙের অগ্নিশিখার মত। সমস্তটা জায়গাটার যেন রঙের লুঠ লেগে গেছে।

‘এত বড় পাখি আমার ভালো লাগে না,’ তাপসী বললে।

সূর্যাস্ত

‘না, বে-পাখি গান করে, তার অঙ্গ হওয়া উচিত।
বে-পাখি সুন্দর, তার ছোট হওয়া উচিত। কিন্তু এই তো
তোমার ছোটরা।’

একটা ঘর ভরে’ অসংখ্য ছোট পাখি—তারা লাফাচ্ছে,
উড়ছে, পাখা ঝাপটাচ্ছে, তাদের ছোট শরীরের পক্ষে যতটা
সম্ভব চ্যাচামেচি করছে। ছোট-ছোট রঙের ঢেউ, সব জড়িয়ে
রঙের অবিশ্রান্ত একটা ফোয়ারা। তাপসী খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে
দেখলো, তারপর বললে :

‘হাজার হোক, শিল্পাজিটা খানিকটা মালুম তো। একটু
দার্শনিক গোছের না হ’লে সে যায় না। তার চোখের ভাষা,
তার ভঙ্গির অর্থ আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু এই পাখির জগত
একেবারে অলাল। সত্যি তাদের কোনো ভাবনা নেই। তারা
বিশেষ-কিছু নয়। শুধু একমুঠো রঙিন, উজ্জ্বল প্রাণ। তারা
কেবল বাঁচে, সেইজন্য তারা এত সুন্দর। ঘরের মধ্যে একটা পাখি
চুকলে আমাদের ভালো লাগে। কেন? হয়-তো একটু স্পর্শ
ভেসে আসে সেই নিবিড় উজ্জ্বলতার। পাখি ভাবে না, আশা করে
না, কান্না আঁটে না। সে শুধু পালকে জড়ানো একটু প্রাণ-স্পন্দন।’

‘পাখিকে মনে হয় বিবাতার খেলার সৃষ্টি।’

‘আর আমরা তাঁর সঙ্কল্পের—না, কী? আমরা তাঁর পরিপূর্ণতার
কাঠামো। মাঝে-মাঝে পাখি হ’তে পারলে মন্দ হ’তো না।’

সূর্য্যযুধী

এক জায়গায় করেক জোড়া আশ্চর্য্য রঙিন লাত্‌বার্জ, হুঁলে বসে' তারা অবিশ্রান্ত ঠোট দিয়ে ঠোকাঠুকি করছে। মাঝে-মাঝে তারা জায়গা বদল করছে, সঙ্গী বদল করছে না কখনো। মিহির একটু তাকিয়ে থেকে বললে :

‘যদি এক ও অবিচ্ছেদ্য বিবাহে বিশ্বাস জন্মাতে হয়, তা হ'লে এই পাখিদের লক্ষ্য করা সব চেয়ে ভালো। আমাদের নীতি-প্রচারের পদ্ধতি বদলানো দরকার।’


‘সারাদিন ধরে’ এরা প্রেম করছে! এদের ক্লাস্ত লাগে না কখনো?’

‘তার চেয়েও আশ্চর্য্য, এরা যে পরস্পরকে মেরে ফেলে না। কিন্তু আমাদের নিজেদের মানে এদের বিচার করতে গেলে চলবে না। তা ছাড়া, এ-জিনিস মানুষের মধ্যেও খানিকটা আছে বই কি। শিম্পাঞ্জি এ-রকম প্রেম করতে পারে না, তবু মানুষ পারে। মনে করতে হবে, পাখিদের কাছ থেকেই সে শিখেছে। জীবতত্ত্বের হিসেবে যা তার নিছক স্বভাব নয়, এমন অনেক জিনিস সে নিয়েছে অন্যান্য প্রাণীদের থেকে। মানুষ এই পৃথিবীর মাইক্রোকস্ম। সত্যি, মানুষের মত আশ্চর্য্য জীব আর নেই।’

সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে- আসতে মিহির আবার বলতে লাগলো :

‘মানুষ অরাস্ত করছিলেন! অনুকরণ দিয়ে। সেটা বুদ্ধির প্রথম

সূর্যাস্ত

‘স্তর  ভ্রমকরণ করবার ক্ষমতা মানুষ আর বানর ছাড়া অল্প কোনো প্রাণীর নেই। কোনো নক্ষত্র সঙ্গে অবিশ্রান্ত নিজেকে মিলিয়ে নিতে-নিতে একদিন সেটাই স্বভাবের অংশ হ’য়ে পড়ে।’

সাপ আর কুমীর, হিম্মো আর গগুর শেষ করে’ তারা এলো বিরাট মাংসভুকদের কাছে। উৎকট গন্ধে বাতাস ভারি। ভিড় সেখানেই সব চেয়ে বেশি। দর্শকরা কেউ-কেউ নাকে কুমাল চাপছে, কিন্তু তাদের মুখ চোখ সরিয়ে আনতে পারছে না। ‘জীবনের এটা একটা মন্ত আনন্দ’, মিহির মন্তব্য করলে, ‘কোনো ভয়ঙ্কর বস্তুর এত কাছাকাছি থাকা, অথচ সত্যিকারের কোনো বিপদ নেই। অভিনয় দেখে কান্নার মত। হৃৎকের কষ্টটা না পেরে হৃৎকের রোমাঞ্চটা পাওয়া। অত্যন্ত উচ্চরের খিল।’

‘হয়-তো’, তাপসী বললে, ‘হয়-তো বন্দী বাঘ থেকে আমরা পরোক্ষ খানিকটা তৃপ্তি পাই—যে এমন ভয়ঙ্কর, তার এই দূরবস্থা দেখে নীচ গোছের উল্লাস। লোকগুলোর মুখের ভাব যেন এই—কেমন জল ? এইবার কেমন !’

‘সে তো স্বাভাবিক। স্বভাবতই বে জরী, সে তার জরের কোনো হিসেবই রাখে না। দুর্বল একবার কোনোরকমে প্রবলকে পরাস্ত করতে পারলে তার আক্ষালন সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে যায়।’

সূর্যমুখী

‘বাঘ মারবার জন্ত মাছের কী সাংঘাতিক তেঁড়খোঁড় ! রাজা-মহারাজারা কাগজে চিঠি লেখেন, যাতে জলের উপর কারো হাত না পড়ে । তাদের মারবার জন্ত বাঘকে অকর ও নিরাপদ রাখা চাই ।’

তারা একটা বাঘকে দেখছিলো, সেটা নতুন এসেছে । খাঁচার মধ্যে অবিশ্রান্ত কোণাকুণি পাখচারি করছে, উজ্জল, জলন্ত এক জন্ত, প্রতিটি পেশী যেন ইস্পাতের তৈরি । বার্নিশ-করা সোনার উপর ঘন কালো ডোরা-কাটা তার শরীর । সুন্দর, বে-রকম সুন্দর এক বস্ত্র পশ্চাই হ’তে পারে । দেখতে মনে হয় বিড়ালের মত নরম, লীলারিত ; কিন্তু তার আড়ালে রয়েছে প্রচণ্ড, অপরিমের শক্তি ।

‘আশ্চর্য্য’, তাপসী মুগ্ধবরে বলে’ উঠলো, ‘আশ্চর্য্য ।’

‘আশ্চর্য্য’, মিহির পুনরাবুত্তি করলে । ‘বহি. কখনো রাতে তোমার ঘুম না আসে, তাপসী, তুমি ভেড়ার পালের কথা ভেবো না । সাঁহা মেঘের কথা ভেবো না । কি ফুলের বাগানের, কি বিকেলে নৌকোর গারে নদীর জলের ছলছলানির । বাঘের কথা ভেবো, উজ্জল, নিঃসঙ্গ বাঘ । রাত্রির কালো অরণ্যে আশ্রনের মত বাঘ জলছে । সে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে, সমস্ত রাত্রি ভরে’, নিঃশব্দে । ভাবো তার কথা ! ভাবো তার প্রবল, অন্ধকার জীবনের কথা । আপনাতে সে পরিপূর্ণ । সে মর

সূর্যাস্থী

তার শিশুর জীবনের মধ্যে । তার জীবনের অন্ধকার শ্রোত বয়ে' বাজে রাজির তিতর ঘিরে, নিবিড় অরণ্যকে প্রাবিত করে' । সে লোভ করে না, যেটুকু তার দরকার তার বেশি নেয় না । সে ভালোবাসে না, ভালোবাসার চেষ্টায় সে হাঁপিয়ে ওঠে না । আর সে হিংসা করে না, মারতে যায় না । সে মারে, বধন তার দরকার ; কিন্তু মারতে সে চায় না, মনে-মনে সে কখনো বলে না, “আমি ওকে মারবো, আমি ওকে মারবো ।”

‘আর সেই বাঘকে আমরা মারি, আশ্চর্য্য উজ্জল সেই বাঘ, হাতির পিঠে চড়ে’, একশো লোকজন নিরে, তীব্র হিংস্র আলো দিয়ে তাকে বিধে । বাঘের চোখের দিকে তাকিয়ে ছাখো, সবুজ মশালের মত চোখ । আর স্ত্রীলোকের চোখের সম্মোহন সেই চোখে । তার দিকে তাকিয়ে থাকলে তুমি চোখ ফেরাতে পারবে না । হঠাৎ-তো, বহি যথেষ্ট দীর্ঘ সময় তাকিয়ে থাকতে পারো, বাঘ তোমাকে চিনবে, এসে দাঁড়াবে তোমার কাছে মাথা নিচু করে’, তুমি হাত দিয়ে ওর ঘাড়ের নরম উষ্ণতা অনুভব করতে পারবে । কিন্তু তার সেই সম্মোহনকে আমরা আমরা ভয় করি । তা থেকে চোখ ফেরাই, তাকে নষ্ট করে’ দিতে চাই, উপড়ে কেলতে চাই । আমরা জানি যে তার চোখের সেই আগুনকে প্রথমে মারতে না পারলে তাকে আমরা মারতে পারবো না । আর সেইজন্নেই তো তার মুখের উপর কেলি

সূর্যাস্ত

ইলেকট্রিক টর্চের তীব্র আলো। আর তারপর বন্ধু হুঁড়ি। আমরা ভয় করি, তার চোখকে আমরা ভয় করি। কেননা আমাদের চোখে বে আলো নেই। আমাদের চোখ মরা। বাঘ ঘে আমাদেরকে খেয়ে ফেলে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই।’

‘বাঘটা একবার তাকাচ্ছে না আমাদের দিকে’, তাপসী বললে, ‘আমাদেরকে লক্ষ্যই করছে না।’

‘ভয়মহিলাকে অপমান!’ মিহির হেসে উঠলো, ‘এবারে সরি, চলো। বড় লোক জমছে।’

বাঘের দিকে শেষ দীর্ঘ দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে তাপসী সরে’ এলো। ভিড় ঠেলে’ তারা আন্তে-আন্তে এগোলো। কয়েকটা দরজা পরে একটা সিংহ। দেখেই মনে হয় বয়েস হয়েছে। কেশর গেছে করে’। ফিকে হ’য়ে এসেছে গায়ের বাদামি-ধূসর রঙ। চলে’ বেড়াবার পর্য্যন্ত উৎসাহ নেই, আধ-শোরা অবস্থার আধ-বোজা চোখে বিষোচ্ছে।

‘দেখে কষ্ট হয়’, তাপসী বললে। ‘সিংহকে ঘেন কিছুতেই চিড়িয়াখানার মধ্যে খাপ খাওয়ানো যায় না।’

‘তবু—ওর মাথাটা একবার দ্যাখো, ওর পেট, ওর কোমর। এদের দেখলে মনে হয় মানুষই হচ্ছে সৃষ্টির কলঙ্ক।’

‘সৌন্দর্যের প্রতিবোগিতার, অন্তত, একেবারে শেষের বেক্ষিতে তাতে সন্দেহ নেই।’

সূর্য্যমুখী

‘একটু নড়ে চড়ে’ বসে’ সিংহ এক বিশাল হাই তুললো। দেখা গেলো তার মুখের বিশাল গুহা। তার প্রকাণ্ড চওড়া জিহ্বা সাধাটে, কর্কশ; ছ’পাশের কোণাচে কুকুর-দাঁত ছুরির ভগার মত ধারালো। প্রায় আধ মিনিট সে রইলো মুখ খুলে; তারপর মাথা নামিয়ে নির্গত করলে অশ্রুট শব্দ।

‘কিছু ওর ভালো লাগছে না,’ তাপসী বললে।

খানিকটা তারা সিংহকে দেখলো। সে যেন মরে’ যাচ্ছে, দেখে এমনি মনে হয়। একটা শিথিল চাবুকের মত পড়ে’ আছে তার লেজ। মাঝে-মাঝে লেজের প্রান্তধেঁশে খর্ব্ব কেশগুচ্ছের কীণতম আন্দোলন। তার কোনো উৎসাহ নেই—কোনো দুঃখও নেই। তার বন্দী অবস্থার বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ পর্য্যন্ত করে না। তার প্রাণ-শক্তি টুইয়ে-টুইয়ে তার ভিতর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, প্রতি মুহূর্তে, একটু-একটু করে’। সে যেন নিজেকে শাস্তভাবে গুছিয়ে নিয়েছে মরবার জন্য। চিরকালের মত বিশাল এক ক্লান্তি তাকে আচ্ছন্ন করেছে। কোনো রাগ তার নেই, কোনো আশা, কোনো অনুশোচনা। তাকে ঘিরে রয়েছে নিঃসীম নিঃস্পন্দ শূন্যতা। সি-সি মাছির কামড় যে খেয়েছে সেই অফ্রিকাবাসী যেমন তার বাড়ির ধোর-গোড়ার স্তরে-স্তরে মরে—মুহূর্তের পর মুহূর্ত, দিনের পর দিন, অবিশ্রান্ত, মম্বর, একটু মম্বরভাবে, এমন কি—তেমনি রয়েছে এই সিংহ, বিনা কটে, বিনা চেষ্টায়,

সূর্যমুখী

ইচ্ছা না-করে', প্রতিরোধ না-করে', নিজেকে সম্পূর্ণ-সমর্পণ করে' ।

তাপসী বললে, 'মন-থারাপ হ'য়ে বার বৈশিষ্ট্য দেখলে ।'

‘এসো মন ভালো করা যাক,’ বলে' মিহির তাকে সে-সব জায়গায় নিয়ে গেলো, যেখানে রয়েছে বিস্তৃত কমিক জীবেরা, যারা নিছক বাড়াবাড়ি, সুকুমার রায়ের ছবির মত । জিরাফ আর বাইসন, উটপাখি আর অতিকায় কচ্ছপ, ফ্রেমিংগো আর ক্যাঙারু । তারপর ঘুরে-ঘুরে তারা এসে উপস্থিত হ'লো যেখানে খালে-ঘেরা খোলা জায়গায় ওরাং-ওটাং দম্পতী সুখে বসবাস করছে, 'পৃথিবীর বৃহত্তম ইঁদুরের' সঙ্গে নিবিড় বন্ধুতায় ।

‘যাক,’ তাপসী বললে ‘আমাদের আত্মীয়দের কাছে ফিরে আসা গেলো ।’

‘যদিও শিম্পাঞ্জির মত অন্ত নিকট নয় বোধ হয় ।’

‘দেখেই বুঝতে পারছি । শিম্পাঞ্জিটা দম্বরমত অসুখী । অসুখী হবার ক্ষমতা ওর খুব বেশি পরিমাণেই আছে, মনে হয় । আর এদের জাতি—কী-রকম ক্ষুর্ন্তবাক ।’

সত্যি, ওদের দেখে মনে হয় সুখী কুকুরের মত ক্ষুর্ন্তবাক । প্রায় মাদুকের সমান লম্বা, মাদুকের বিশৃঙ্খল চওড়া, পাঁওটে রঙ, মুখের ভাব হাসিমুখি, বেপরোয়া, এই বানর-বৃগল অবিশ্রান্ত খেলা করছে, মুখ ভ্যাঙ-চাচ্ছে, লাফাচ্ছে, গড়াচ্ছে, কৃত্রিম ডাল থেকে

সূর্যাস্ত

ডালে, সমস্তটা কীকা জারগা ভরে'। কখনো দু'জনে জড়াজড়ি করে' গড়ীতে-গড়াতে খালের ধারে এসে ঠেকছে, কখনো একজন রাস্তিতে থাকবার ঘরের পিছনে লুকোচ্ছে, আর-একজন কিরছে তাকে খুঁজে—তারপর হঠাৎ পিছন থেকে মাথার উপর এক টাটি। তাদের নড়াচড়ার এমন ছন্দ, যেন শ্রিং-এ চলছে তাদের শরীর।

'আন্ত দুটো ক্লাউন,' তাপসী হাসতে-হাসতে বললে।

'শিল্পাজিটাও মাঝে-মাঝে ভাঁড়ামি, করে, কিন্তু সে হয়-তো জানে যে সে ভাঁড়ামি করছে, হয়-তো খানিকটা ইচ্ছে করে'ই সঙ্-লাজে। কিন্তু ওরাং-ওটাং তা জানে না। এরা একেবারেই জন্ম-সঙ্।'।

'উঃ', তাপসী বলে উঠলো, 'কতরকম কসরতই ওরা জানে! কিন্তু কী ওদের ভঙ্গিতে শ্রী।'।

'এমন অনুমান করলে ভুল হয় না বোধ হয় যে এদের দেখেই মানুষ নাচতে শেখে। কী-রকম বাপা চাল, বেখেছো, এতটুকু খুঁত নেই। আর মানুষের চলাফেরা বেতালা, মানুষের বেহে এত সহজ গতি নেই। কিন্তু সে সেটা পুঝিয়ে নিলে। শিখলে নাচতে। অসভ্যদের নাচ, মোটারকম হার্লেকুইন নাচ, আজকালকার কাবারে নাচ তো এদেরই অসভ্যের অনুকরণ। তা-ই মনে হয় না তোমার?'

সূর্যাস্ত

‘কেবল একটা কথা মনে হয়। কাবারে এদেরকে হার মানিয়েছে শতশত’, বলে’ তাগসী হেসে উঠলো।

খানিকক্ষণ তারা দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে। বিকেল হ’য়ে এলো; শোনা যাচ্ছে মাংসভুকদের গর্জন। জন্তুদের খাবার সময়। বাগানের লোক এলো হাতে একটা বদনা, কুটি আর কলা নিয়ে। তক্তার সাঁকো পার হ’য়ে সে গেলো ওরাং-ওটাং-এর উপনিবেশে। রাখলো একটা কলাই-করা থালা খানিকটা খরগোস খানিকটা ইঁদুরের মত দেখতে সেই অদ্ভুত, নামহীন জন্তুর সামনে। এতক্ষণ সে নিশ্চল হ’য়ে পড়ে’ ছিলো, বাঁবাঁমি একটা পাখরের মত, তার বাকানো শরীর মোটা-মোটা রৌয়ার আচ্ছন্ন। এত ছোট তার মাথা যে দেখা যায় না; বোকা যায় না চোখ আছে কি নেই। এইবার থালার কাছে মাথা নিয়ে সে খেতে লাগলো, কুট-কুট করে’, তার ছোট-ছোট ধারালো দাঁত দিয়ে আশ্চর্য্য ক্ষুদ্রবেগে। প্রায় অদৃশ্য ভাবে সে খেলো, শুধু তার ছুঁচলো ঠোঁট সক্রিয়, বাকি সমস্ত শরীরে একটুকু নড়াচড়া নেই। তার নিশ্চলতার সঙ্গে ওরাং-ওটাংয়ের অক্লান্ত উচ্ছলতার প্রতিধাত একটা দেখবার জিনিস।

লোকটাকে দেখতে পেয়েই বানর-বংশী ছুটে এলো তার কাছে, হাত থেকে কেড়ে নিতে চাইলো খাবার। লোকটা একটার

সূর্যমুখী

গালে মারলে এক চড়, তারপর খাণ্ড বিতরণ করে' দিলে সমান করে'। একটানে ছিড়লো কলার খোসা, আন্ত রুটি আর কলা চলে' গেলো তাদের মুখে। লুঝ আনন্দে তারা চিবোতে লাগলো তাদের ফুলে-গুঠা গালের পেশীগুলো দ্রুত গুঠা-পড়া করছে, তাদের চোখের তারা আর ভুরুতে এসে ঠেকেছে। তারপর খাবার গেলা হ'য়ে গেলে, তারা নিজে থেকেই লোকটির সামনে এসে দাঁড়ালো হাঁ করে', পিছন দিকে মাথা হেলিয়ে, আকাশে চোখ তুলে। লোকটি তাদের গলার মধ্যে ঢেলে দিলে আফিম-মেশানো পাংলা চা; তারপর 'ইঁদুরের' সামনা থেকে ঈশোটা কুড়িয়ে নিয়ে চলে' আসতে লাগলো। একটা ওরাং-গুটাং এলো তার পিছন-পিছন, কেবলই মুখ আর হাত বাড়াতে লাগলো। লোকটি মুখ ফিরিয়ে দিলে তাকে এক ধমক, দ্রুতপদে সাঁকোঁ পার হ'য়ে এসে একটানে তক্তাটা তুলে নিলে।

তাপসী বললে, 'যেথেকে মনে পড়লো। চা না খেলে আর তো বাঁচিনে।'।

'চলো বাই.।'

পথের উপর গাছের ছায়া পড়েছে দীর্ঘ হ'য়ে, বিকেলের হাওয়ার কাঁপছে পাতাগুলো। ঝকঝকে রোদে হেসে উঠেছে সমস্ত বাগান। চায়ের ধোকানের দিকে যেতে-যেতে :

সূর্যাস্থী

‘চিড়িয়াখানা হচ্ছে পিউরিটানের ইন্সুল’, গ্রিহিব বললে।
‘এখানে এলে একটা কথা অন্তত সে বুঝতে পারবে, যা সে ভুলে’
থাকতে চায়, ভুলে’ থাকবার প্রাণ-পণ চেষ্টা করে—যে মানুষ
কাপড়-চোপড় নিয়েই জন্মায় না। এই সহজ কথাটা একবার
মেনে নিতে পারলে এত অসুখী সে হ’তো না, অস্ত্রের জীবনও
ভুলতো না বিবময় করে’। আর তাহ’লে সে তার নিজের শরীরকে
ভালোবাসতে পারতো। তা পারে না বলে’ই সে এক সুহৃৎের
শাস্তি পায় না জীবনে। তার যে একটা শরীর আছে, এ-কথা
ভাবতে তার অসহ্য লাগে। নিজেকে ঘৃণা করে সে-জন্ত।

‘কিন্তু সে এই পশুদের দেখতো—নিজের শরীরের মধ্যে
তাদের কী নিবিড় সম্পূর্ণতা। দেখতো তাদের শ্রী, তাদের
স্বাচ্ছন্দ্য, তাদের নির্লিপ্ততা। তারা প্রত্যেকে-এক-একটি অচেতন
প্রাণের দ্বীপ; তারা সুকৃত; অন্ধকারে, তারা প্রত্যেকে পরিপূর্ণ
নিজের জীবনে। বনে-জঙ্গলে তারা থাকে, ঝোপে-ঝাড়ে, মাঠে
আর গাছে—তারা বিভিন্ন, তারা অসংখ্য। কিন্তু একজন
আর-একজনকে এড়িয়ে চলে, প্রত্যেকের জন্ত তার নিজস্ব,
অতুলনীয়, অপরিপূর্ণ জীবন। তারা কেউ কাউকে ঝাঁটাতে আসে
না, ভাগ বসাতে চায় না অস্ত্রের জীবনে, নিজের জীবনের ভাগ
দিতে যায় না অন্তকে। মানুষের পক্ষে এটা কী শিক্ষা,
ভাবো! জীবন থেকে চরমতম নিষ্ঠুরে নেবার চেষ্টার জীবনকে

সূর্যাস্ত

তারা নষ্ট করে না। তাদের মধ্যে শান্তি ; আহিম বিশাল ধৈর্য্য। ঈর্ষি বা কিছু হারালুম—এ-ভয়ে তারা কাতর নয়। নিজের নিঃশব্দতাকে তারা ভয় করে না : নিজেকে তারা ভয় করে না। তারা বা নয়, তা ছাড়িয়ে অস্ত-কিছু হ'য়ে উঠতে গিয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলে না। অত্যাচার করে না নিজের উপর, নিজেকে হত্যা করতে চায় না। "They do not lie awake at night and weep for their sins."

তারা বাচ্ছিলে আঁকাবাঁকা খালের পাশ দিয়ে। হঠাৎ তাপসী বললে :

‘এসো না এখানে একটু বসি। চা না-হয় একটু পরেই খাবো।’

‘হয়-তো আর সময় থাকবে না।’

‘তা হ’লে বাড়ি গিয়েই খাবে। কিন্তু এখানে একটু বসি, এসো। কী যে ক্লান্ত লাগছে, তুমি ভাবতে পারবে না।’

রাস্তা থেকে নেমে ছ’জনে, হাঁটতে লাগলো ঘাসের উপর দিয়ে। খালের একেবারে ধারে এসে তারা বসলো, ঘাসের উপর, তাদের একদিকে বন গাছের সারি সোনালি আলোর ঝলোমলো। বিকেল বনিরে আসছে, দীর্ঘতরো হ’য়ে আসছে ছায়া। খালের স্বচ্ছ, শুষ্ক জলের মধ্যে গাছগুলোর নীলাভ ছায়ার দিকে তাকিয়ে তারা ধানিকঙ্কণ চূপ করে’ রইলো।

স্বর্গমুখী

হঠাৎ উঠলো হাওয়া, উতলা দক্ষিণে হাওয়া, বিকেলের
বুকের উপর একটুখানি বসন্ত লুটিয়ে পড়লো। খালের স্নান জল
উঠলো শিরশির করে, একটা অলস হাস ভেসে গেলো, জলের
ভিতরে গাছের স্থির ছবি গেলো ভেঙে। তারা হু'জনে হু'দিকে
তাকিয়ে রইলো, কেউ কিছু বললে না।

ঘোলাটে হ'য়ে এলো আলো; ছায়াগুলো যেন পরস্পরকে
তাড়া করছে, ছটফট করছে রাত্রিতে মিশে যেতে। মৃদু ডেউয়ের
মত হাওয়া এসে লাগলো তাদের বুকে। হাসটা পাড়ে উঠে
এনে পাখার জল ঝাড়ছে, বুকের মত বরে' পড়ছে জলের কৌটা।
গাছগুলোর মাথার লোনার কুরাশা লেগে রয়েছে যেন। আর
হাওয়া বইছে দক্ষিণ থেকে, হাওয়া বইছে, যে-হাওয়া ফুল ফোটায়,
যে-হাওয়ার রক্ত মাতাল হ'য়ে ওঠে।

হঠাৎ দূর থেকে ভেসে এলো শিশুর আনন্দ-ধ্বনি। যেন
চমকে উঠে মিহির মুখ ফিরিয়ে তাপসীর দিকে তাকালো।
তাদের চোখোচোখি হ'লো। এক দীর্ঘ নিবিড় সুহৃৎ তারা
পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলো; তারপর মিহির আন্তে হাত
বাড়িয়ে তাপসীর একখানা হাত তুলে নিলে। বললে, 'আমাকে
ছেড়ে যেনো না।'

সুহৃৎকাল তাপসী চুপ করে' রইলো, কেঁপে উঠলো তার
চোখের পাতা। তারপর:

সূর্যমুখী

‘এ-কথা কেন বলছো ?’

‘তুমি যদি জানতে !’ আর অশ্রুটন্বরে মিহির বলে উঠলো ।

‘জানি, জানি । আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারো না ?’

আর-একবার তাদের চোখ পরস্পরের মধ্যে মগ্ন হ’য়ে গেলো । একটা মুহূর্ত কাটলো । তাপনীর কালো চুলে বললে উঠলো বোলা আলো । মিহিরের হাতের উপর একটু চাপ দিয়ে লে বললে :

‘এত ভয় কেন তোমার ?’

‘আমাকে ছেড়ে যেয়ো না’, মিহির সন্মোহিতের মত বললে, ‘আমাকে ছেড়ে যেয়ো না ।’

‘কী ভাবছো তুমি বলো তো ?’

‘আমি নিজেকে অনেক কষ্ট দিয়েছি । আমি ভুল করেছি ।’

‘কিন্তু এখন তো আর কিছুতে কিছু এসে যায় না ।’

‘আমার জানা উচিত ছিলো । হয়-তো—যদি অপেক্ষা করতুম—’

‘বোলো না’, তাপনী ব্যাকুলতায় বলে উঠলো, ‘ও-সব বোলো না । এতে কি তুমি খুশি নও ?’

মিহির মাথা নিচু করে চুপ করে রইলো । তাপনী আবার বললে, ‘এ-ই কি যথেষ্ট নয় ? সমস্ত পৃথিবীতে আর কী আছে, বলো ?’

সূর্যমুখী

মিহির চোখ তুলে এতক্ষণে প্রায় কাপসা হ'য়ে আসা গাছ-
গুলোর দিকে তাকালো :

‘না, আর-কিছু নেই। সে-ই তো ভয়, তাপসী।’

‘সে-ই তো সুখ। আর-কিছু তুমি কেন ভাবছো? চেয়ে
দ্যাখো, আমার দিকে চেয়ে দ্যাখো। তুমি বুঝতে পারো না?’

‘তাপসী, এ আমি সহিতে পারছিনে।’

তারপর হু'জনেই চুপচাপ। এক ঝাঁক পাখি উড়ে গেলো
তাদের মাথার উপর দিয়ে। খালের বিলিমিলি-জল থেকে-থেকে
কঁপে উঠছে। ফিকে আকাশ ছড়িয়ে পড়ছে বনের সৌরভের
মত।

এমনি তারা বসে' রইলো অনেকক্ষণ, হাতে হাত ধরে', জান
জলের দিকে তাকিয়ে, সন্ধ্যার আচ্ছন্ন। অনেক কথা বুঝুদের
মত ভেসে উঠলো তাদের মনে, মিলিয়ে গেলো। ‘ভাষা নেই;
কোনো কথা বলা যায় না। চারদিক চুপচাপ হ'য়ে এলো,
নামলো ছায়া। গাছগুলো সেং ছায়া-স্থানে অস্পষ্ট। হু'জনে
তাকিয়ে রইলো সেইদিকে, জীবনের নিগন্তরেখার দিকে যেন।
হাওয়ার একটা চূর্ণালক তাপসীর কপালের উপর এসে পড়লো,
যেন কার নিঃশ্বাস লাগলো তার মুখে। হঠাৎ সে কঁপে উঠলো।

‘চলো’, নিঃশ্বাসের স্বরে সে বললে।

সন্ধ্যার একটু পরেই মিহির বাড়ি ফিরলো। তাপসীর সঙ্গে

মৃত্যুমুখী

বেশিক্ষণ থাকতে সে সহ করতে পারছিলো না। চুপে-চুপে সে তার ঘরে ঢুকলো, যেন ভয়ে-ভয়ে। তার মনে একটু ঘা সহিবে না এখন। এ সে কিছুতেই ভাঙতে দিতে পারে না, তার মনের এই অপক্লপ মুচ্ছা। সে বসে পড়লো একটা ইঞ্জি-চেয়ারে, জামা-কাপড় বদলাবার কথা মনে হ'লো না। তুলে নিলে একটা বই—পড়বার অন্তে নয়, অভ্যাস থেকে। খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো ছাপানো পৃষ্ঠার দিকে, দৃষ্টিহীন চোখে। তারপর তার খেরাল হ'লো তার চা খাওয়া হয়নি, আর তার একটু মাথা ধরেছে।

হৈমন্তী এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'চা কি খেয়ে এগেছিল?'

'না, দাও।'

আর যখন সে তার বিলম্বিত চা খাচ্ছে, আর মৃণাল ব্যস্ত রান্নাঘরে, হৈমন্তী ছেলের গুব কাছে এসে দাঁড়ালেন। মিহিরের সমস্ত শরীর সজ্জিত হ'য়ে উঠলো। আর তার নাড়িতে-নাড়িতে মুহূর্তে বয়ে' গেলো অজ্ঞাত, নাহীন একটা ভয়।

'একটা কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

অন্ত-কোনো দিন কি হ'তে পারে না? কাল? বে-কোনো দিন? কিন্তু আজ নয়, এখন নয়। এখন সে সহিতে পারবে না। কিন্তু সে কিছু বললে না, কিছু বলতে গেলেই তো মনে আঁচড় পড়বে।

সূর্য্যমুখী

‘মৃণালের সবচেয়ে একটা কথা।’

সাদা হ’য়ে গেলো মিহিরের মুখ। অতি কীণভাবে সে উচ্চারণ করলে, ‘কী, বলো?’

‘ওকে নিয়ে কাল একবার লেবা-সদনে বাবি?’

‘ওর অসুখ করেছে?’

‘না। বোধ হয়—বোধ হয় ওর ছেলে হবে।’

‘মা!’ মিহির অকুত, চাপা গলার চীৎকার করে উঠলো। আর-কিছু বললে না। হৈমন্তী আরো অনেক কথা বলে গেলেন, সে অল্পষ্ট চোখে তাকিয়ে রইলো তাঁর দিকে। কিছু শুনলে না, কিছু বললে না। মা, তার মনের মধ্যে শুধু এই একটা কথার ঢেউ উঠছিলো। মা, শেষ পর্য্যন্ত তোমারই জয় হ’লো।

মা, তোমারই জর হ'লো। পৃথিবীতে আরো একজন মা, কমতার নির্ধর, সর্বদা অপরাধের। প্রাণের নাভি-উৎস থেকে উৎসারিত চিরন্তন বন্ধন। সেই অন্ধকারে আমাদের জীবনের মূল। অন্ধকার সেই নাভি-কূপ, প্রাণ-কেন্দ্র, তার সঙ্গে আমাদের আত্মার সীমাহীন বৃত্ত-রচনা। তার মধ্যে আমরা বন্দি। নাড়ি কেটে ফেলা হয়, কিন্তু সংযোগ ছিন্ন হয় না : তা থেকে যার, অবিচ্ছেদ্য, অনস্বীকার্য, আমাদের সমস্ত জীবন ভরে, আমাদের শৈশব কাটিয়ে ওঠবার অনেক পরে : মা যখন চিতার তন্ম হ'য়ে গেছেন, তারও পরে। মাতৃ-নাভির সঙ্গে সেই সংযোগ-বৃত্তের মধ্যে চিরকাল আমাদের চলাফেরা ; চিরকাল তার সঙ্গে আত্মার তত্ত্বতে-তত্ত্বতে আমরা জড়িত। আর মিহির—সে আরো একজন মা তৈরি করলো। যে-মেয়ে তার আত্মার কোনোখানে নেই, তাকে সে মা করলে। তাকে দিলে ভীষণ মাতৃশক্তি। যাকে সে আর-কিছু দেয়নি, যাকে 'সে ভুলে' থাকতে চেয়েছে, বুছে ফেলতে চেয়েছে, যার সঙ্গে কখনো তার কোনো প্রকৃত সংস্পর্শের আলো জ্বলেনি, তাকে দিলে সেই ইচ্ছার নির্ধর শক্তি, যার কাছে তার নিজের জীবন পরাজিত, লাহিত, বিখণ্ডিত। আর যুগালের সেই ক্রমতা যার উপর সে তো সে-ই, সে তো তারই সত্তা নুতুন করে' জন্ম নিরেছে ; আর তার ভিতর দিয়ে যুগালের

সূর্যমুখী

অন্ধ ইচ্ছা তো জয়ী হচ্ছে তারই উপরে, মিহিরেরই জীবনের উপরে।

আচ্ছা। কিন্তু এ-ই চরম নয় ; এ ছাড়াও আছে, এর বাইরেও আছে। ঈশ্বরকে ধন্তবাদ, আমরা কেবল আমাদের শরীরের মধ্যেই বাঁচি না। ঈশ্বরকে ধন্তবাদ, মানুষের এমন দুরবস্থা কখনো হয় না যে সে তার জীবনকে অন্ধকারে পেতে না পারে। অন্তত মিহিরের মত মানুষের হয় না। সে তা হ'তে দেবে না কিছুতেই। তার জীবনের একটা নিভৃত অন্ধকার আছে বা তার নিজের। বা হয় হোক, তার উপর দখল সে ছাড়বে না। শরীরের জীবনে সে পরাস্ত ; কিন্তু তার সেই অন্ধকার জীবনের খোঁজ কেউ জানে না। কোনো মা, কোনো স্ত্রী সেখানে আসতে পারে না তাদের শরীর-শক্তি নিয়ে ; বাড়াতে পারে না তাদের নরম, নির্দম হাত। তাদের জন্ত নিজেকে সে টুকরো করে' ফেলবে, যদি করতেই হয়, কিন্তু সেই অন্ধকার থাকবে সম্পূর্ণ, সঙ্গোপন, অব্যাহত।

সুতরাং ব্যাপার যেমন ছিলো তেমনি রইলো। দে-স্ত্রী মা হ'তে চলেছে, তার প্রতি স্বামীরা যা-কিছু কর্তব্য, মিহির সব করলে। তাকে নিয়ে যায় মাঝে-মাঝে সেবা-সদনে, তার সঙ্গে গল্প করে, তার জন্ত নিয়ে আসে ছোট-খাটো উপহার। তার মা-র সঙ্গে সে লড়বে শেষ পর্যন্ত ; হেরে গিয়েও সে হার মানবে না।

সূর্যমুখী

কিন্তু ভিতরে-ভিতরে সে রইলো বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ। প্রথম
ধাক্কা যখন কেটে গেলো, মিহির বললে নিজের মনে, 'হোক না,
কী এসে যায়?' তাপসীর কথা তার মনে পড়লো: 'এখন
আর কিছুতেই কিছু এসে যায় না।' না, এখন আর কিছুই এসে
দাঁড়াতে পারে না তাদের মাঝখানে। যা হবার হোক। কিছুই
আর একে নষ্ট করে' দিতে পারে না। 'অসময় বলে' কি ঈশ্বরকে
দোষ দেবো?' মিহির মনে-মনে বললে, 'বলবো কি—হ'লো
যদি, ছ'দিন আগে কেন হ'লো না?' ওরে মুচ ছবর, চুপ কর,
চুপ কর, হ'তে যে পারলো, এ-ই কি কম আশ্চর্য্য! যা হয়েছে,
ছ'হাত ভরে' তাকে নে, জীবন ভরে' তাকে নে।

হাসগুলো কেটে যেতে লাগলো। আবার বর্ষা এলো, বর্ষা ছুরিরে এলো। মৃণালের শরীর উঠলো ভারি হয়ে, তার পদক্ষেপ ক্ষয়তরো। হঠাৎ কঁপে-কঁপে উঠছে তার এতদিনের স্বস্তি। স্নান হ'য়ে এসেছে তার মুখের অগ্নি-আভা। সেই পোকা, সেই ব্যাঙ, সেই মাছ—বা একটু-একটু করে' মানুষ হ'য়ে উঠেছে, বা এতদিনে প্রায় মানুষ হ'য়ে উঠেছে, তা শোষণ করে' নিচ্ছে তার সমস্ত যৌবন, যৌবনের জীবন্ত রক্ত।

এক রাজে, সময় যখন আসন্ন, মৃণাল চুপ করে' তার স্বামীর কাছে এসে দাঁড়ালো। মিহির বই পড়ছিলো, চোখ তুললো না। কিন্তু মৃণাল সরে' গেলো না; অনেক, অনেকক্ষণ ধরে' তাকিয়ে রইলো তার স্বামীর নিবিড়, নিবদ্ধ মুখের দিকে। তারপর আন্তে-আন্তে একখানা হাত এনে রাখলো স্বামীর হাতের উপর।

এ-রকম সে কখনো করে না। মিহির চমকে উঠলো। বই-খানা কোলের উপর নামিয়ে রেখে চাইলো চোখ তুলে। মৃণালকে যেন বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। বেচারী! হয়-তো তার মনে ভয় হচ্ছে। হয়-তো সে কিছু বলতে চায়; হয়-তো সে একটু আশ্বাস চায়।

মৃণালের হাতের উপর আন্তে একটু হাত বুলিয়ে সে বললে : 'কেমন আছো?' খুব নরম স্বরে বললে, যেমন করে' আমরা শিশুর সঙ্গে কথা কই, কি রোগীর সঙ্গে।

মৃত্যুমুখী

‘আমার তো কিছু হয়নি।’

‘কিন্তু তুমাকে আজ ভালো দেখাচ্ছে না।’

‘ও কিছু নয়।’ তারপর, একটু চুপ থেকে :

‘তোমার একটু সময় হবে ?’

মিহির বইখানা বন্ধ করে’ টেবিলের উপর সরিয়ে রাখলো :

‘কিছু বলবে ? বলো না।’

মৃণালের আঙুলগুলো মিহিরের আঙুলের সঙ্গে জড়িয়ে গেলো।

মিহির অনুভব করতে পারলে চামড়ার উপর তার নখের
ক্ষীণ স্পর্শ। হঠাৎ মৃণাল বললে :

‘আমার উপর তুমি রাগ কোরো না।’

মিহির অবাক হ’রে তার মুখের দিকে তাকালো।—‘রাগ কেন
করবো ?’

‘আমাকে ঘোষ দিয়ো না’, মনে-মনে, রুদ্ধস্বরে মৃণাল বলে’
উঠলো। ‘আমাকে ঘোষ দিয়ো না।’

মিহির তার হাত ছাড়িয়ে নিলে :

‘এ-সব কী তুমি বলছো ?’

‘এটা তুমি জেনো, আমার কিছু ঘোষ নয়’, মৃণাল বলতে লাগলো।

‘আমি কখনো তোমার ভালোবাসা চাইনি। আমি কখনো—’

মিহির তার একখানা হাত কব্জির কাছে ধরে’ তাকে বাধা
দিলে :

সূর্যাস্ত

‘বাও, এখন শোও গে। তোমার শরীর ভালো নেই।’

‘আমাকে একটু বলতে বাও, তোমার পায়ে পড়ি।’

‘বাও, শুয়ে থাকো গে,’ মিহির আবার বললে।

কয়েক মূহূর্ত্ত, মৃণাল স্তব্ধ হ’য়ে রইলো। তার চোখ দিয়ে যেন ঝরে’ পড়ছে তার প্রাণ-স্রোত, মিহিরকে সর্কাক্ষে জড়িয়ে ধরে’। তারপর যেন অসহ্য কষ্টে, অতি ক্লান্তিতে :

‘কেন তুমি আমাকে বিয়ে করেছিলে?’

মিহিরের উপর যেন একটা মোহ ছড়িয়ে পড়লো। সে কিছু বলতে পারলে না, কিছু ভাবতে পারলে না। আরো শক্ত হ’লো তার মুঠি মৃণালের কব্জির উপর। আর মৃণাল বলতে লাগলো, অস্পষ্ট স্বরে, যেন নিজেরই মনে-মনে :

‘তবু ভালোই বলবো। তবু যে তোমার দেখা পেয়েছিলুম এ-ই আমার সুখ। তুমি কি জানো—তুমি কি কখনো ভাবতে পারো আমি তোমাকে কত ভালোবেসেছিলুম?’

যেন অল্প কেউ কথা বলছে, যেন মৃণালের অচৈতন্য থেকে কোনো প্রচণ্ড, অব্যয় শক্তি ঠেলে বার করছে এই কথাগুলো—তাকে দীর্ঘ করে’, তাকে বিক্ষিপ্ত করে’। নামলো নীরবতা, তার যেন কখনো শেষ হবে না। তারপর :

‘তুমি কি কখনো আমাকে এতটুকু ভালোবাসতে পারবে না?’

মিহির মুড়ের মত তাকিয়ে রইলো মৃণালের মুখে। বে-মুঠো

সূর্যমুখী

দিয়ে সে তার কাজি ধরে' ছিলো তা এলো শিথিল হ'রে। আর-
একটা দীর্ঘ, অসহ্য নীরবতার ছেদ।

মৃণাল আন্তে-আন্তে তার হাত ছাড়িয়ে নিলে :

'বুঝলুম। খামকা ব্যথা দিলুম তোমার মনে—ক্ষমা করো',
বলে' সে এক পা সরে' গেলো। তারপর হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে;
অশরীরী প্রেত-স্বরে :

'কিছুই কি তোমার বলবার নেই ?'

মিহিরের চোঁট নড়ে' উঠলো। সে বেন প্রাণপ্রাণ চেঁচা করছে
কিছু বলতে, কিন্তু কোনো কথা বেরলো না।

'থাক্,' মৃণাল বললে, 'থাক্। নিজেকে তুমি আর কষ্ট দিয়ে
না, আমি বাচ্ছি।' তারপর, টেবুল-ল্যাম্পের তৈরি আবছার
ভিতর দিয়ে বেতে-বেতে :

'তুমি মন-খারাপ করো না, আমার কোনো নালিশ নেই।
আমি তো তোমাকে ভালোবেসেছিলুম।' তোমাকে ভালোবেসেই
আমি জুখী হয়েছিলুম।'

এর কয়েকদিন পরেই, সন্দের একটু পরে মৃণাল তার সংসার
তার কাজ, সমস্ত ফেলে রেখে' শুয়ে পড়লো বিছানার, রুখ
পশুর মত। হৈমন্তী তার কাছে গিয়ে তার কপালে হাত
রাখলেন।

'কী রে ?'

সূর্যমুখী

মৃণাল কিছু বললে না, শুধু তার বড়-বড় কালো চোখ তুলে তাকালো।

হৈমন্তী খানিকক্ষণ ধরে তার দিকে তাকিয়ে বললেন : ‘একটু ওঠো। খেয়ে নাও যা পারো।’

‘না, খাবো না।’

‘ধাবে বইকি। খেতেই হবে। ওঠো।’

তাকে নিয়ে গেলেন খাবার ঘরে, বসলেন তার কাছে। বললেন, ‘ভয় নেই, ভয় নেই কিছু।’

মৃণাল কিছুই খেতে পারলে না, কেলে-ছড়িয়ে উঠে এলো। ‘বেশ, এতেই হবে,’ হৈমন্তী বললেন, ‘এসো এবার।’

তাদের শোবার ঘরের পাশে ছোট একটা ঘর প্রস্তুত ছিলো, সেখানে গিয়ে মৃণাল শুয়ে পড়লো। হৈমন্তী লোক পাঠালেন সেবা-সমনে; একবার বেধে নিলেন সমস্ত ওষুধ-পত্র ঠিক আছে কিনা, তারপর এসে বসলেন তার পাশে। ঘরের আলো নেবানো; অন্ধকারে শোনা যাচ্ছে মৃণালের ভারি, অসহান নিঃশ্বাস।

‘কষ্ট হচ্ছে খুব?’ হৈমন্তী জিজ্ঞেস করলেন।

‘না, না।’

‘ভয় কোরো না, চুপ করে’ থাকো।’

মৃণাল চুপ করে’ রইলো। কিন্তু চুপ করে’ থাকা কঠিনতরো হ’লে উঠছিলো প্রতি মুহূর্তেই। তার মাংস কেউ ঘেন ছিড়ে

সূর্যাস্ত

নিরে যাচ্ছে। এমন যন্ত্রণা যে পৃথিবীতে আছে, সে কখনো ভাবেনি। দাঁতে দাঁত চেপে, ছ'হাতের স্থিতি শক্ত করে' আঁকড়ে ধরে' নিশ্চল, নিঃশব্দ, সে গড়ে' রইলো। চেষ্টা করলো অজ্ঞান হ'য়ে যেতে।

কিন্তু তার ধৈর্য্যও ভাঙলো। মিহির যখন বাড়ি ফিরে এলো, রাত দশটার, সে শুনলো সমস্ত বাড়ি ভরে' মৃণালের গোড়ানি। নরম, দীর্ঘ আওয়াজ, আন্তে-আন্তে পরদা থেকে পরদার উঠে যাচ্ছে, যেন রাত্রির কোনো অন্ত পানি ডেকে উঠছে থেকে-থেকে। ঘরের ভেজানো দরজার টোকা দিবে সে ডাকলে, 'মা।'

হৈমন্তী বেরিয়ে এলেন।

'কখন আরম্ভ হয়েছে?'

'সন্দের পরেই।'

'আগে জানলে আমি আর আজ বেরোতাম না।'

'তুই থেকেই বা কী করতিন?'

'না' এসেছে?'

'হ্যাঁ, এসেছে। তুই বা, কোনো ভাবনা নেই।'

'নব ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে নব। তুই বা, খেয়ে নে গে। ভাত চাপা দেয়া আছে—কিছু দরকার হ'লে ছুঁগীকে ডেকে বলিস।'

খেতে বসে' মিহিরের বড় অবাক লাগলো যে আজ তার

সূর্য্যমুখী

খাবার কাছে মৃণাল নেই। এতখানি শব্দের মধ্যে এ-রকম কখনো হয়নি। একদিন মৃণালের একটু অন্তর্ভুক্ত করেনি—আশ্চর্য্য ভালো তার স্বাস্থ্য। কখনো কোনো রোগের কষ্ট সে পায়নি, আর আজ, এখন—কী ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে সে যাচ্ছে।

অজ্ঞানত্বভাবে মিহির ধেরে উঠলো। থেকে-থেকে তার কানে এসে লাগছে গোঙানির আওয়াজ। তা বেন বাড়ছে। তারি অস্বস্তি লাগছিলো তার—যে-কোনো মানুষকে চোখের উপর এ-রকম যন্ত্রণা পেতে কী করে দেখা যায়? এবং কিছু করকার নেই, কিছু যে করার নেই এটাই সব চেয়ে খারাপ।

দুর্গার সাজা একটা পান মুখে পুরে সে আবার সেই ঘরের দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো।

‘মা,’ সে একটু টেচিয়ে ডাকলো।

হৈমন্তী বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, ‘খেয়েছিস?’

‘কত ঘেরি আর?’

‘ঘেরি আছে।’

‘এখনো ঘেরি?’

‘অমন হয়ই।’

মিহির একটু ইতস্তত করে বললে, ‘ওকে একটু দেখা যায় না?’

‘কী করবি দেখে?’

সূর্যাস্ত

‘কেমন আছে ও?’

‘ভালো। ভালোই আছে।’

মিহির আবার একটু চুপ করে’ রইলো।

‘মা, খুব কি কষ্ট?’

‘কষ্ট তো একটু হয়ই।’

‘খুব?’

হৈমন্তী হেসে ফেললেন। ‘তুই বা এখান থেকে। ঘুমোবার চেষ্টা কর।’

মিহির তবু দাঁড়িয়ে রইলো, বেন কী বলতে চার। তখন হৈমন্তী বললেন, ‘আর, ওকে একটু বেখেই বা।’

মিহির দাঁড়ালো চৌকাঠের ধারে। ঘরটি ঘেরতে তর্কি—
নাস, মৃণালের মা আর পিসিমা, বোতল আর ক্যানেলের টুকরো
আর আগুনের হাঁড়ি নিয়ে সবাই ব্যস্ত। একটা উত্তপ্ত গন্ধ
ঘরের বাতাসে। নীল বাল্বে জলছে আলো। বিছানার পড়ে’
আছে মৃণাল, তার চোখ বোজা, ঠোট আটকানো। তাকে দেখে
বিশ্বাস করা শক্ত যে তারই ভিতর থেকে এই দীর্ঘ, অবিচ্যুত
গোষ্ঠানি বেরিয়ে আসছে। মিহির একটু আশ্বস্ত হ’লো। বতটা
মনে হয়, হয়-তো সত্যি-সত্যি তেমন ভয়ানক কিছু ব্যাপার নয়।

হঠাৎ ভাবী মা একটু চুপ করলো। আর সঙ্গে-সঙ্গে
মিহিরের মুখের উপর এসে পড়লো মৃণালের বিশাল উজ্জল

সূর্য্যবুধী

চোখ, যন্ত্রণার বিক্ষারিত, তার কালো গভীরতার কী কথা যেন আলোড়িত হ'রে উঠছে। আর মিহিরের বুকের ভিতর দিয়ে যেন একটা আগুনের স্রোত নেমে গেলো, তাড়াতাড়ি সে সরে' গেলো সেখান থেকে।

নিজের ঘরে এসে চেয়ারে বসে' সে পড়বার চেষ্টা করলে। শুভে যাবার কথা ভাবা অসম্ভব। প্রকাণ্ড, শক্ত খাটের উপর শুভ্র মন্থণ শব্দ্যার দিকে সে তাকালো। যুগলই পেতেছিলো নিজ হাতে, সন্ধ্যার আগে। তার নিজের বালিস দুটো যেখানে থাকবার কথা, সেখানেই রয়েছে।

রাত বাড়লো। চারদিক চুপচাপ হ'রে আসছে। কোথায় ডেকে উঠছে অশান্ত, কুদ্বিত কুকুর। পড়া অসম্ভব, বসে' থাকা অসম্ভব। মিহির উঠে পায়চারি করতে লাগলো ঘরের মধ্যে। আর হঠাৎ একটা তীব্র, তীব্র চীৎকার বাড়ির প্রান্ত থেকে প্রান্তে বেজে উঠলো। মিহির নিজেই প্রায় টেচিয়ে উঠেছিলো, তা এমন ভরানক। সে থমকে দাঁড়ালো। আর তা চলতে লাগলো, সেই নয় নির্ভুর চীৎকার। যে-মেরে কখনো মৃদুস্বরে ছাড়া কথা বলেনি, তার চীৎকারে সমস্ত রাত্রি খানখান হ'রে ভেঙে পড়ছে।

বারোটার পর হৈমন্তী এসে বললেন, 'একজন ডাক্তার, নিয়ে আর বরং।'

সূর্যমুখী

‘খুব কি খারাপ, মা, খুব কি খারাপ?’

‘ডাক্তার একজন থাকে ভালো, তুই যা।’

রাস্তায় বেরিয়ে মিহির বেন হাঁপ : ছেড়ে বাঁচলো। চীৎকার ভেসে এলো তার পিছন-পিছন অনেকদূর পর্যন্ত। তারপর তা আর শোনা গেলো না। আর হঠাৎ মিহিরের মনে হ’লো :

‘যদি ও মরে’ যার, যদি ও মরে’ যার।’

বাকিটা রাত চুঃস্থপ্নের মত কাটলো। মিহির ভালো করে কিছু টের পেলো না। চেউয়ের পর চেউ, থেকে থেকে বেজে উঠছে চীৎকার ; স্তনভে-স্তনভে সে প্রায় পাগল হ’য়ে গেলো। তারপর এক সময়ে তা থামলো, মৃণাল মুচ্ছিত হ’য়ে পড়লো। হঠাৎ সমস্ত বাড়িতে অদ্ভুত অস্বাভাবিক স্তব্ধতা।

ভোরের দিকে ডাক্তার বললে, ‘বড় কঠিন প্রসব, একজনের প্রাণের আশঙ্কা।’ জানা গেলো, মৃণালের শরীরের গঠনে কোথায় কী একটা দোষ আছে ; সত্যি বলতে, মাতৃস্থের সে ঠিক উপযুক্তই নয়।

‘কোনো উপায় কি নেই এখন?’

‘চেষ্টা করবো বধাসাধ্য। চেষ্টা করবো দু’জনকেই বাঁচাতে। বলা যায় না।’

‘শিশু না-হয় মরলোই।’

‘দেখি।’

সূর্যমুখী

ভোরের প্রথম আলোর সঙ্গে-সঙ্গে ফরসেপ্‌স্ দিয়ে টেনে বার করা হ'লো লাল মাংসের একটা পিণ্ড। মাথাটা চেপ্টে গেলো। সেটার নিঃশ্বাস পড়ে না, সেটা কাঁদে না। যাক, আপদ গেছে।

কিন্তু নব-মাতার মুখটা ভাঙলো না। হৈমন্তী তার গালের উপর হাত রাখলেন, এখনো তা উষ্ণ। ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'ভালো করে' একটু দেখুন ডাক্তারবাবু, আরো ভালো করে' দেখুন।'

‘এখন ছেলেটাকে দেখবার দরকার।’

কিন্তু ইতিমধ্যে মৃণালের মা সেই লাল মাংসপিণ্ডকে তুলে নিয়ে জোরে তার গা রগড়াছিলেন। হঠাৎ সে পরম উল্লাস কঁদে উঠলো, ঘেন ঘোষণা করলে, ‘আমি এসেছি।’

আলো ফুটলো আকাশে। ডাক্তার নিজেরই অমূল্য চেহারা করে' বাড়ি ফিরলো। ‘মৃণালের মা শিশুকে কোলে করে' বসে' আছেন, তাঁর চোখ দিয়ে যে জল পড়ছে তিনি নিজেই তা টের পাচ্ছেন না। হৈমন্তী মৃণালের শিররে বসে' কুঁপিয়ে-কুঁপিয়ে কাঁদছেন। তা ছাড়া সমস্ত চূপচাপ; ঝড়ের রাজির পর শান্তি।

তখন মিহির গেলো সেই ঘরে, দাঁড়ালো মৃণালের পাশে। জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়ছে তার বিছানায়। তার চোখ বোজা, দীর্ঘ, কালো পলকগুলো প্রায় গাল ছুঁয়েছে। তার হাত ছাঁট ছু'পাশে এলিয়ে আছে, কয়েকটা চুল খলিত হ'য়ে পড়েছে

সূর্য্যমুখী

কপালে । যেন ঘুমিয়ে আছে । তার ঠোঁটের কোণে যেন হাসির
একটু আভাস । মিহির অনেকক্ষণ চুপ করে' তাকিয়ে রইলো,
দেখলো । তার ইচ্ছে হ'লো একটু স্পর্শ করে, সাহস হ'লো না ।
অনেক, অনেকদূর; তাকে এখন আর হোঁরা যায় না । একটু
হাসির আভাস তার ঠোঁটে—সে যেন কী গোপন কথা জানে,
যেন তাকে নিয়ে গেছে সঙ্গ করে', সে-কথা আর কেউ জানবে
না ।—সে এখন একা ।

কী ভয়ানক একা, মিহির ভাবলে ।

মৃণালের মা শিশুকে নিয়ে চলে' গেলেন, আবার বাড়িতে মা আর ছেলে। কিন্তু সে-বাড়ি আর নয়। এখানে আর সহজে নিঃশ্বাস ফেলা যায় না। সারাক্ষণ কী বেন ফিস্‌ফিস, ফিস্‌ফিস্‌ করছে। সমস্ত বাড়ি ভরে' ছড়িয়ে রয়েছে মৃণাল। চলতে ফিরতে তার উপর হাঁচট খেয়ে পড়তে হয়। তাকে না-ছুঁয়ে একটা কাজ করবার উপায় নেই। সমস্ত বাড়ি সে ভরে' রয়েছে, আচ্ছন্ন করে' রয়েছে, সমস্ত বাড়ি সে চেপে ধরেছে তার অদৃশ্য সত্তা দিয়ে। কে জানে মানুষের কোনো প্রেত-সত্তা আছে কিনা, কিন্তু এই তো সব চেয়ে ভয়ঙ্কর, নিষ্ঠুর প্রেত—কখনো তা ছাড়া দেয় না, প্রতি মুহূর্তে তা হানা দিচ্ছে, প্রতি মুহূর্তে। সকালে ঘুম থেকে উঠে চা খেতে বসে' মিহিরের মনে পড়ে :

‘এই সময় সে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকতো।’

রাত্রিতে বিছানায় শুতে গিয়ে মনে পড়ে : ‘ঐখানটায় সে ঘুমিয়ে থাকতো।’

‘খেতে বসে' ভালো করে' খেতে পারে না; মনে-মনে বলে, ‘ওখানে সে বসতো, সাড়ির কালো পাড় তার পায়ে এসে পড়েছে।’

হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে হয়-তো দেখতো, ন'টা বেজেছে, আর তার মনে হ'তো : ‘এই সময়ে বাথরুম থেকে তার

সূর্যাস্ত

মানের ছলছলানি স্তনতে পেতুম ।’ আরনার দিকে তাকিয়ে তার বুকের ভিতরটা হঠাৎ ঝোচড় দিয়ে ওঠে :

‘এ-আরনার তার ছায়া আর পড়বে না ।’

আর সেই বাড়ি যেন মিহিরের মনে অদ্ভুত একটা মোহ বিস্তার করলে, হ’য়ে উঠলো তার আশ্রয় একটা অংশ। সেখানে পাকতে তার অসহ লাগে, কিন্তু সেখান থেকে সে বেরোতেও পারে না। সারাদিন সে বাড়ি বসে’ থাকে, কিছু করে না। শুধু চুপ করে’ তাকিয়ে বসে’ থাকে। আর অদ্ভুতব করে, বাড়িটা তাকে জড়িয়ে ধরছে, তাকে ভরে’ ফুলছে। মনে-মনে বোঝে যে এ অসম্ভব, এ-রকম করে’ বাঁচা: যাবে না, কিন্তু এড়াতেও পারে না। বাড়িটার যেন আলাদা একটা সত্তা কুটে উঠছে—তা কথা কয়, তা কথা কয়। মিহির চুপ করে’ শোনে।

কাটলো একমাস। কিছু বদলালো না। বাড়িটা কথা কয়। ফিস্‌ফিস্‌, ফিস্‌ফিস্‌। রাত্রিতে ঘুম হয় না। হাওয়ার মধ্যে কী যেন ভেসে বেড়ায়। আর তার শক্তি যেন ক্রমশই বাড়ছে, এই বাড়ির, এই পরিপূর্ণ জীবন্ত শূন্যতার। না, সত্যি এ-বাড়িতে থাকা অসম্ভব হ’য়ে উঠছে।

শেষটায় একদিন হৈমন্তী বললেন : ‘অনেকদিন মনে-মনে ভেবেছি তীর্থগুলো ঘুরে আসবো। এতদিন কেবলই মনে হয়েছে

সূর্যমুখী

সময় নেই, এইবার দেরতা সময় করে' দিয়েছেন। তুই আমাকে নিয়ে চল ।'

মিহির বুঝলো। বললে, 'চলো।'

'তা হ'লে খামকা ঘেরি করে' লাভ নেই।'

'না, সব ব্যবস্থা করে' ফেলো।'

তাপসী একটা চিঠি লিখেছিলো মিহিরের স্ত্রী-বিরোগের খবর পেয়ে, তার উত্তর দেয়া হয়নি। যেদিন তাদের কলকাতা ছেড়ে যাবার কথা, তার কয়েকদিন আগে মিহির ছোট একটা চিঠি লিখলে :

'মা-কে নিয়ে বাইরে যাচ্ছি শিগগিরই। কোন্-কোন্ জায়গায় যাবো এবং কবে ফিরবো এখনো কিছু ঠিক নেই। হয়-তো শিগগির না-ও ফিরতে পারি।:- তোমার সঙ্গে দেখা করার সময় হ'লো না। এমন যদি হয় যে তোমার সঙ্গে আর দেখা হ'লো না, এ-কথা মনে কোরো যে তোমাকে কখনো ভুলবো না।'

আর পরের দিন বিকেলে মিহির যখন তার স্থানীয় সাহিত্যিক বন্ধুদের কাছে চিঠি লিখেছে, আর-কিছু করার নেই বলে', সময় কাটাতে হবে বলে', ঘরের পরদা সরিয়ে এক স্ত্রী-মূর্তি দেখা দিলে। নাক্ষিত্রে উঠলো মিহিরের ছত্ৰপিশু, এমন প্রবলভাবে সে চমকে উঠলো যে কাগজের উপর হস্ত তার কলমের নিব নিচের দিকে একটা আকাবাকা লাইন টেনে গেলো। পরমুহুর্তে :

সূর্যাস্ত

‘ও, তুমি,’ নিঃশ্বাস ছেড়ে মিহির বললে।

তাপসী তার দিকে এগিয়ে এলো।—‘তোমাকে দেখতে এলুম।’

তারপর, তার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে :

‘কী চেহারা হয়েছে তোমার !’

মিহির কাগজ-কলম সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালো।—‘বোলো।

না—ওখানে নয়, এসো এদিকে।’

জানলার নিচে একটা সেট, সেখানে তাপসী বসলো। মিহির দাঁড়িয়ে রইলো তার পাশে। একটু চুপচাপ। কিছুই যেন তাদের বলবার নেই পরস্পরকে।

‘মা-কে ডেকে আনি,’ মিহির বললে।

‘আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে তাঁর। তিনিই তো আমাকে তোমার ঘর দেখিয়ে দিলেন।’

‘তিনি তোমাকে কিছু বললেন ?’

‘না। নিজের পরিচয় দিতে যাচ্ছিলুম, তিনি বললেন “বুঝতে পেরেছি, তুমি তাপসী তো ?”’

‘তুমি কোনো আলাপ করলে না তাঁর সঙ্গে ?’

‘করবো। কিন্তু তোমার সঙ্গে আগে আমার কথা বলা দরকার। তুমি বসবে না ?’

মিহির বসলো তাপসীর পাশে। তাপসী বললে :

‘কতদিন তোমাকে দেখিনি।’

সূর্য্যবুধী

‘তোমাকে প্রায়ই আমার মনে পড়েছে।’

‘কেন যাওনি?’

‘জোর করে’ যেতে চাইনি।’

তাপসী চারদিকে একবার তাকালে।—‘আর এই ঘরে তুমি আবদ্ধ হ’য়ে আছো?’

মিহির মাথা নিচু করলে, যেন লজ্জায়।—‘আমি দুর্ব্বল, তাপসী, আমি দুর্ব্বল।’

‘এ-ঘরের রুদ্ধ হাওয়ায় তুমি কেমন করে’ বাঁচবে?’

‘সেইজন্মই তো চলে’ যাচ্ছি।’

‘চলে’ যাচ্ছে! কিন্তু সে তো পালিয়ে যাওয়া। পালিয়ে গিয়েই কি তুমি বাঁচবে?’

মিহির তার চুলের মধ্যে গভীরভাবে হাত ঢুকিয়ে দিলে।
‘দেখি চেষ্টা করে’।’

‘না, পালিয়ে যেয়ো না। যার কাছে থেকে আমরা পালাই সে তাড়া করে আমাদের পিছন-পিছন, তাকে আমরা ছাড়িয়ে যেতে পারিনে কখনো, তার কাছে আমাদের হার। মিহির, তুমি হার মেনো না।’

মিহির স্থিরদৃষ্টিতে মেঝের দিকে তাকিয়ে বললে, ‘তুমি কেন এলে?’

‘আমি বুঝতে পারছিলাম, বুঝতে পারছিলাম। তোমাকে

মৃত্যুমুখী

বেধতে পাচ্ছিলুম এই ঘরে, হাওয়া চেপে বসেছে তোমার বুকের উপর ভারি হ'য়ে। মিহির, এ তুমি করছো কী? এখানে যে নিঃশ্বাস পড়ে না, ছায়া থমথম করে দেয়ালের কোণে-কোণে। এ যে ভূতুড়ে বাড়ির মত মারা দিচ্ছে ঘেরা। আর এই বাড়ির কাছে নিজেকে তুমি সমর্পণ করেছো, ধরা দিয়েছো সেই হাতে। নিজের তুমি কী করেছো বুঝতে পারো না?’

মিহির, তার দৃষ্টি মেঝের উপর আবদ্ধ :

‘কমা করো, আমাকে তুমি কমা করো। তুমি বাও।’

কিন্তু তাপসী তার একটু কাছে সরে’ এলো :

‘কিন্তু কেন তুমি ভয় করছো? কেন তুমি লুকিয়ে থাকছো? আমার দিকে তাকাও, আমার দিকে তাকাও।’

মিহির আন্তে-আন্তে চোখ তুললো। তাপসী বললে, ‘তোমার চোখে ক্লান্তি। তোমার চোখে মৃত্যুর বাসনা। তুমি কি মরতে চাও? তুমি কি নিজেকে দিয়ে দিতে চাও, হারিয়ে ফেলতে চাও? বলো। কথা কও, মিহির, কথা কও।’

কিন্তু মিহিরকে যেন ঘিরে রয়েছে একটা মূর্ছা। মৃত্যুর বাসনার বিহ্বল চোখে তাপসীর দিকে তাকিয়ে সে বললে :

‘কী বলতে হবে আমি জানিনে।’

তাপসী একটু ঘুরে বসে’ সোজা মিহিরের চোখে তাকালো :
‘তোমার মুখে পড়েছে এই বাড়ির ছায়া। কতকাল, আর

সূর্যাস্থী

কতকাল নিজেকে তুমি এমন করে' নষ্ট হ'তে বেবে ? জানলা খুলে দাও, জানলা খুলে দাও । ঘরে আলো আনুক, বয়ে' বাক্ বাইরের হাওয়া । মিহির, শুধু এই রক্তধ্বাস অন্ধকারই একমাত্র লভ্য নয়, আকাশও আছে । সেই আকাশ তোমার—আর আমার । তাকে তুমি কেমন করে' ভুললে ?

কিন্তু মিহির, মুচ্ছা-মগ্ন, নিশ্চেতন, মাথা নাড়লে :

'এখন আর সময় নেই । আমি চলে' যাচ্ছি । তোমাকে মনে রাখবো । তাপসী, তোমাকে মনে রাখবো ।'

'কেন তুমি যাবে ? কোথায় যাবে ?' কী হবে গিয়ে ? যদি হাওয়া না বয়, যদি আলো না ফোটে, যদি এই মুচ্ছা না ভাঙে—যেখানেই যাও, তুমি তো মরতেই যাবে । মিহির, তুমি কি মরবে বলে' পণ করেছো ?'

যেন কঠিন কণ্ঠে মিহির উচ্চারণ করলে : 'তুমি চুপ করো, তাপসী, তুমি চুপ করো ।'

'না, না,' তাপসী বলে' উঠলো । 'ওঃ, মিহির, জানলা খুলে দাও । কথা কও । হাসো । হাসতে ভয় কারো না । হাসি দিয়ে ভাঙো এই মুচ্ছা—এই মায়ী । কঠিন, নিশ্চল এই পাথর । পাথর হ'রে উঠছো তুমিও বে । ভিতরে-ভিতরে তুমি পচে' উঠছো । প্রার্থনা করো সূর্য্যের কাছে, সূর্য্য তোমার মধ্যে জ্বলে' উঠুক । নতুন জগৎ হোক তোমার প্রাণের । ওঃ, মিহির, আমাকে

সূর্যমুখী

‘এত করে’ বলতে হচ্ছে কেন? তুমি কি বুঝতে পারো না? তুমি কি বুঝতে পারো না?’

মিহির কিছু বললে না। বসে’ রইলো মাথা নিচু করে’, হাঁটুর উপর কহুই রেখে, চুলের মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে। তার চোখ যেন কিছু দেখছে না; তার সমস্ত শরীর ঘিরে এক বিশাল উদাসীনতা, অন্ধতা। কয়েক মিনিট নিঃশব্দে কাটলো। তারপর তাপসী আন্তে-আন্তে বললে :

‘আমাকে এক গ্লাস জল দিতে পারো?’

একটি কথা না-বলে’ মিহির উঠলো, দিলে কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে এনে। তাপসী জল খেলো, তারপর গ্লাসটা সরিয়ে রেখে:

‘মনে কোরো না তোমাকে আমি বুঝতে না পারি। কিন্তু মিহির, ভালোবাসার চেয়ে ভালোবাসার দল্লকে বড় করে’ তুলো না। হুঃখের চেয়ে বড় কোরো না শোককে। তোমার হুঃখকে ভালোবেসো না, হুঃখ ভালোবাসবার জিনিস নয়। যদি মরে’ গিয়ে থাকো সে তো ভালোই : মাঝে-মাঝে তো মরতেই হয়—বাচবারই জন্ত, মিহির। মৃত্যু শেষ নয়, মৃত্যুতে তুমি থেমে থাকো না—সেটাই যে পরম মৃত্যু। মৃত্যুকে ছাড়িয়ে যাও, মৃত্যু পাল্শু হ’য়ে নতুন জীবনে। মৃত্যুতে নতুন জীবনের উৎস, জীবন নিজেকে নতুন করে’ সৃষ্টি করে মৃত্যুর ভিতর দিয়ে। সেই জীবনকে তুমি নাও।’

সূর্যাস্ত

তবু মিহিরকে শুক, অবিচলিত বেখে তাপসী উঠে নীড়ালো।
তার সামনে ঝাড়িয়ে নিবিড়, শাস্ত্রস্বরে বললে :

‘মিহির, তুমি কি মৃত্যুকে তোমার উপর জয়ী হ’তে দেবে?’
আর হঠাৎ মিহিরের সমস্ত শরীর বেন কেঁপে উঠলো। চোখ
তুলে সে তাকালো তাপসীর দিকে, সে-চোখের গভীরতায় বেন
এখনো অজ্ঞাত এক আলোর হ’রে-ওঠবার জন্ত ছটফটানি।
তাপসী বলতে লাগলো :

‘জীবনকে অস্বীকার কোরো না। জীবনকে তুমি নাও,
তোমার জীবনকে তুমি নাও।’ তারপর, মিহিরের খুব কাছে
সরে’ এলে, উত্তপ্ত, ঈষৎ-কম্পিত স্বরে :

‘মিহির, কি তুমি ইচ্ছে করে’ মরবে, তুমি কি জীবনকে ভয়
করবে? তোমার কি সাহস হবে না নিজের জীবনকে নিতে?’

মিহির হু’হাতে মুখ ঢেকে ভাঙা-ভাঙা গলায় বলে’ উঠলো :
‘তুমি কেন এলে? তুমি কেন এলে?’

‘কষ্ট হচ্ছে তোমার? হোক—তার মানে তো এ-ই যে
মুছ’ ভাঙছে, পাথর ভেঙে যাচ্ছে। তোমার মুখ তোলো, আমার
দিকে তাকাও। আমি তোমার জন্ত মৃত্যু এনেছি, এনেছি
তোমার জীবন। তা তুমি জানো, তা তুমি জানো। আর
সেইজন্তই তোমার ভয়, তুমি মুখ ঢেকে আছো সেইজন্তই।’

তাপসী মেঝের উপর হাঁটু গেড়ে মিহিরের পাশে বসে’ পড়লো,

সূর্যমুখী

হুঁহাতে তার মাথা টেনে আনলো তার বৃকের কাছে । মিহির পাংশু মুখ তুলে তাকালো, তার চোখ অশ্রুতে উজ্জ্বল ।

তাপসী বললে : ‘আমার মধ্যে তোমার মুক্তি, আমার মধ্যে তোমার জীবন । তুমি তা জানো, জানো, জানো । কেন তবে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছে অমন করে’ ? আমাকে তুমি নাও, আমাকে তুমি নাও ।’ বলতে-বলতে তাপসী মিহিরের ঘন চুলের উপর তার মুখ চেপে ধরলো ।

কয়েকটা মুহূর্ত নিঃশব্দে গড়িরে গেলো । তারপর হুঁজনে উঠে দাঁড়ালো । তাপসী তাকালো মিহিরের চোখের মধ্যে, অশ্রুতে তার অন্ধতা ধুয়ে গেছে, তার মধ্যে সূর্য্যের বিলিমিলি । হাসবার চেষ্টা করে’ তাপসী বললে, ‘চলো আমার সঙ্গে একটু বেরোবে । অনেকদিন তুমি বাড়ি থেকে বেরোও না’

মিহিব বললে, ‘এখন আর না-বেরোগেই চলে ।’

‘না’ তবু চলো । চলো ।’

‘একটু বোসো’, বলে’ মিহির মুখ ধুতে চলে’ গেলো । সেই ঠাঁকে তাপসী আরনার কাছে দাঁড়িয়ে চুলটা একটু ঠিক করে’ নিলে ।

হুঁজনে একসঙ্গে ঘর থেকে বেরলো । সিঁড়ির কাছে এসে হৈমন্তীর সঙ্গে দেখা ।

‘আমি তো তোমাদের জন্ত চা করতে বাচ্ছিলাম ।’

‘ধরকার নেই, মা । আমরা বেরাচ্ছি ।’

সূর্যাস্থী

‘বেকজো ?’ হৈমন্তী বেন কণাটা বুকে পাবলেন না ।

‘হ্যাঁ, মা, বেকজি ।’

ছ’জনে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো । হৈমন্তী ঠাণ্ডা, সাদা
ক্ষুণ্ণিত তাকিয়ে রইলেন তাঁদের পিছনে ।

